বালা-মুসীবত ও মহামারী : সীরাতে মুস্তাকীমের পথনির্দেশ

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

বর্তমান বিশ্বে করোনা নামে একটা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। গোটা বিশ্বের মানুষ এর ভয়ে আতঙ্কিত। দুনিয়াদাররা তো এই ভাইরাসকে আল্লাহর চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে। তারা মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হয়ে বাঁচার জন্য প্রাণপণ ছুটোছুটি করছে; কিন্তু শেষরক্ষা হচ্ছে কী? হচ্ছে না। দুনিয়াদাররা এ জন্য পেরেশান যে, তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়াই সব; মরে গেলো তো সব হাতছাড়া হয়ে গেলো। পক্ষান্তরে যারা খাঁটি মুসলমান তারা পেরেশানীমুক্ত; মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না। কারণ তারা জানে, মুসলমানদের জন্য দুনিয়াটাই শেষ নয়। দুনিয়ার যিন্দেগীর পর তাদের জন্য রয়েছে এক শান্তিময় জীবন।

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

অর্থ: 'আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন।' (সূরা আনকাবূত–৬৪)

সে হিসেবে একজন মুমিন বান্দা আল্লাহ তা'আলার রহমতের প্রতি এই আশা রাখে যে, সে এই মুসীবতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। প্রশ্ন হতে পারে, মুমিন-মুসলমান আর দুনিয়াদার তথা কাফের-মুশরিক সবাই তো মানুষ, তাহলে চিন্তাধারায় এই পার্থক্য কেন? বস্তুত পার্থক্যকারী বস্তু হচ্ছে তাকদীরের প্রতি ঈমান। কাফের-মুশরিকগণ যেমন পরকালে বিশ্বাস রাখে না, তেমন তাকদীরেও বিশ্বাস রাখে না। তাদের ধারণা হল, যা-কিছু হয়, প্রাকৃতিক কারণে হয়। আর এর প্রতিকার বা আত্মরক্ষা নিজেদের প্রচেষ্টা, সাবধানতা ও উপায়-উপকরণের মধ্যে নিহিত। ফলে যে কোন দুর্যোগ ও মুসীবতে তারা স্রেফ বাহ্যিক উপায়-উপকরণের দিকে ছুটতে থাকে। পক্ষান্তরে মুমিন বান্দা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকাতকে সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। কে কতদিন হায়াত পাবে, কে কখন মৃত্যুবরণ করবে, কে কী পরিমাণ রিযিক প্রাপ্ত হবে সব লেখা হয়ে গেছে এবং এই লেখায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৬৫৩)

অতএব প্রকৃত মুমিন বান্দা করোনা ভাইরাস নিয়ে পেরেশান হবে না। কেননা কেউ নির্দিষ্ট সময়ের দশ বছর আগেই মারা যাবে এমনটি ঘটার কোন আশংকা নেই। প্রত্যেকের মৃত্যু নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট মিনিটের নির্দিষ্ট সেকেন্ডেই হবে; এক সেকেন্ড আগেও হবে না, পরেও হবে না।

মহামারী কেন আসে?

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যখন অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, যিনা-ব্যাভিচার ব্যাপক হয়ে যায় তখন মহামারী দেখা দেয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৪০১৯)

এ জাতীয় গুনাহ একসময় প্রকাশ্যে ব্যাপক আকারে সংঘটিত হতো ইউরোপ আমেরিকায়। এখন বৃটিশ সিলেবাসের হাত ধরে আমাদের দেশেও চলে এসেছে। একজন মহিলার সব চেয়ে বড় সম্পদ তার সতীত্ব। বর্তমানে ইংরেজী শিক্ষিত মেয়েদের অধিকাংশের কাছে এই মহামূল্য সম্পদের কোন কদর নেই। রাস্তা-ঘাটে, পার্কে-পার্টিতে যেখানে সেখানে তারা ব্যবহৃত হচ্ছে। এভাবে যখন যিনা-ব্যাভিচার বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল, তখন আল্লাহর আযাবও আসল বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি জনপদে পৌঁছে গেছে করোনা ভাইরাসের কঠিন আযাব।

আল্লাহ মুমিনদের পরম বন্ধু। বিপদাপদে ভরসা কেবল তারই উপর থাকবে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

অর্থ: 'হে নবী! আপনি বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর মুমিনরা যেন সবকিছুতে তারই উপর ভরসা রাখে।' (সূরা তাওবা–৫১)

সুতরাং আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তার বাইরে কোন কিছু ঘটবে না। অন্যত্র বলেছেন,

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: 'আর তিনি মুমিনদের পরম বন্ধু।' (সূরা আলে ইমরান–৬৮)

নিয়ম হল, যিনি পরম বন্ধু তিনি বন্ধুর জন্য ক্ষতিকর কিছু লিখতে পারেন না। কিন্তু অনেক সময় আমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করে বসি; যদিও আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল কোন ক্ষতি করেন না। আল্লাহ তা'আলা এমন পরাক্রমশালী ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যার হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। তিনিই এই সুবিশাল আসমান ও যমীন মাত্র দেড় অক্ষরবিশিষ্ট 'কুন্' শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সেই তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন– وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ অর্থাৎ হে বান্দা! তুমি যখন কালিমা পড়ে মুমিন হয়েছো, তোমার কর্তব্য হল, সকল ব্যাপারে একমাত্র আমারই উপর ভরসা রাখা, সবকিছু আমারই উপর ছেড়ে দেয়া, অন্য কারও প্রতি আশা না রাখা এবং অন্যদিকে ছোটাছুটি না করা। কাজেই করোনা সংক্রমণের ভয়ে কাবাঘর বন্ধ করার এবং মসজিদ-মাদরাসা বন্ধ রাখার কোন প্রয়োজন নেই। বরং কর্তব্য হল, এগুলো সম্পূর্ণ খোলা রেখে দলবদ্ধভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করা। কিন্তু অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা আমাদেরকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে সেই পরম বন্ধু আল্লাহ থেকে দূরে রাখার অপচেষ্টায় অনেকটাই সফল হয়েছে।

দুনিয়া পরীক্ষাগার, এখানে নেয়ামত-মুসীবত উভয়টি দিয়েই পরীক্ষা করা হয়

দুনিয়া পরীক্ষার স্থান, বিচারের স্থান নয়। বিচারের জন্য আলাদা দিন ধার্য রয়েছে। তবে দুই-একটা বিচার আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও করে থাকেন। অর্থাৎ অন্যায় করার সাথেসাথেই পাকড়াও করে ফেলেন। এটা অনেকটা প্রচলিত মোবাইল-কোর্টের মতো। উদাহরণস্বরূপ ফেরআউন, নমরূদ, কারূন, আবূ জাহাল, আবূ লাহাবদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই ধ্বংস করেছেন। অতঃপর আখেরাতের আসল শাস্তি তো রয়েছেই।

তো দুনিয়া বিচারের স্থান নয়, পরীক্ষার স্থানমাত্র। এখানকার পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থ: 'আমি তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থার দ্বারা পরীক্ষা করেছি। যাতে তারা

সঠিক পথের দিকে ফিরে আসে।' (সূরা আরাফ-১৬৮)

দেখা যাচ্ছে, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দিয়েও পরীক্ষা করেন, মুসীবত দিয়েও পরীক্ষা করেন। মজার বিষয় হল, আল্লাহ তা'আলা যে সকল মুসীবত দ্বারা বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন, সেগুলো বাহ্যিকভাবে মুসীবত মনে হলেও মুমিন বান্দার জন্য বিলকুল মুসীবত নয়। কেননা দেখতে মুসীবত হলেও এর আড়ালে লুকানো থাকে বড় বড় নেয়ামত। অর্থাৎ মুসীবতে পড়ে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকলে এবং সবরের পথ অবলম্বন করলে বান্দা এমন কল্পনাতীত নেয়ামতের অধিকারী হয়, যার কিছু অংশ তাকে দুনিয়াতেই প্রদান করা হয়, আর অবশিষ্ট পুরোটা দেয়া হয় আখেরাতে। হাদীসে এসেছে, কিয়ামত দিবসে মুসীবতের পরকালীন বিনিময় দেখে বান্দা আফসোস করে বলবে, আল্লাহ! দুনিয়াতে মুসীবতের মাধ্যমে আমার শরীর কেঁচি দ্বারা কাটা হয়নি কেন? অর্থাৎ সে হতভম্ব হয়ে পড়বে যে, সামান্য সামান্য মুসীবতের বিনিময়ে এমন এমন বড় পুরস্কার! বোঝা গেলো, দেখতে মুসীবত মনে হলেও মুমিনের জন্য তা নেয়ামত।

মুমিনের উপর মুসীবত কেন আসে?

প্রশ্ন হতে পারে, মুমিন যখন আল্লাহ তা'আলার বন্ধু এবং মুমিনের জন্য মুসীবতও নেয়ামতস্বরূপ তাহলে মুমিনের উপর বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত কেন আসে? উল্লিখিত আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা এর উত্তর প্রদান করেছেন যে, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ অর্থাৎ তাদেরকে মুসীবতে লিপ্ত করা হয়, যেন তারা সীরাতে মুস্তাকীমের উপর ফিরে আসে।

দুনিয়াতে মুসীবত আসলে কাফের-মুমিন সবাই আক্রান্ত হবে। তবে পার্থক্য হল, কাফেরদের উপর মুসীবত আসে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আযাবস্বরূপ। আর মুমিনের উপর মুসীবত আসে তাকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর ফিরিয়ে আনার জন্য। মুমিন বান্দা যখন দুনিয়ার ধোঁকায় ও ধান্ধায় পড়ে এদিক-সেদিক চলে যায় তখন তাকে সীরাতে মুস্তাকীমের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য মুসীবত দেয়া হয়।

মুসীবত আসলে করণীয় হল তাওবা করা, শিক্ষা গ্রহণ করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

অর্থ: 'তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতিবছর তারা দু'-একবার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তথাপি তারা তাওবাও করে না এবং উপদেশও গ্রহণ করে না।' (সূরা তাওবা-১২৬)

এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, মুসীবত আসলে আমাদের দায়িত্ব দু'টি–

এক. অতীতের গুনাহের জন্য তাওবা করা।

দুই. মুসীবত থেকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা।

অর্থাৎ যে ভুল হয়ে গেছে তার জন্য খুব অনুশোচনা ও কান্নাকাটি করা এবং সামনে যেন না হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকা।

সাধারণত কাফেররা উল্টাপাল্টা করলে আল্লাহ তেমন ভ্রুক্ষেপ করেন না। কিন্তু মুমিন হয়ে ভণ্ডামী করলে আল্লাহ তা'আলা বরদাশত করেন না। আমরা আজ কাফেরদের মতো হয়ে গেছি। বৃটিশ সিলেবাসের মাধ্যমে ইংরেজরা আমাদের মধ্যে এই ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে যে, জাতি হিসেবে তারাই অগ্রসর ও উন্নত। সুতরাং অন্যরা রীতি-নীতি ও বেশভূষায় যতো বেশি তাদের অনুকরণ করতে পারবে ততো বেশি উন্নতি করতে পারবে। ইংরেজদের এই ধোঁকায় পড়ে আমরা মুসলমানরা যতোই তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি ততোই খোদার গযবে পতিত হচ্ছি। মনে রাখতে হবে, ইয়াহুদী-খৃস্টানদের জীবনপদ্ধতি আমাদের উন্নতির পন্থা নয়। আমাদের উন্নতির পথ ও পন্থা কিয়ামত পর্যন্ত সেটাই নির্ধারিত, যে পথ ও পন্থায় সাহাবায়ে কেরাম উন্নতি করেছিলেন। সেই পথ হল- ঈমানের পথ, আমলের পথ এবং দাওয়াত ও মুজাহাদার পথ। এই পথে অগ্রসর না হয়ে কাফেরদের কথা মতো নামায-রোযা বাদ দিয়ে, মসজিদ মাদরাসা বন্ধ করে আমরা কিছুতেই বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবো না।

আজ আমরা কাফেরদের গোলামী করছি। আরবদেশগুলো ইয়াহুদীদের ইশারায় পরিচালিত হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে সারাবিশ্বের মুসলমানদের উপর। ইয়াহুদ-নাসারাদের এ গোলামীর জিঞ্জির আমাদের পা থেকে দ্রুত খুলে ফেলা দরকার।

মুসীবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়

বিপদ আসলে আমাদের কাজ হল, আল্লাহ তা'আলার চাহিদা কি তা জানা এবং মানা। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদেরকে কয়েকটি কাজ করতে হবে।

এক. তাকদীরে বিশ্বাস মজবুত করতে হবে যে, ভালো-মন্দ যা-কিছু হয়, সব আল্লাহরই হুকুমে হয়।

দুই. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান হতে হবে। হাদীস শরীফে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে অর্ধেক ঈমান বলা হয়েছে।

তিন. বেশি বেশি দু'আ করতে হবে। বিশেষ করে এই দু'আটি নিয়মিত পড়তে হবে–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট শ্বেত-রোগ, উন্মাদনা, কুষ্ঠ এবং সব ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি হতে আশ্রয় কামনা করছি।'

চার. মসজিদ ও বাসা-বাড়িতে দিনের কোন একটা সময় সীরাত তথা নবীজীর জীবনীগ্রন্থ হতে কিছু অংশ তা'লীম করতে হবে।

এই আমলগুলো মুসীবত থেকে বাঁচার পরীক্ষিত উপায়।

করোনাকালীন অবসর সময়ের আমল

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

অর্থ: 'দু'টি নেয়ামত এমন, যার ব্যাপারে মানুষ উদাসীন থাকে। একটি হচ্ছে সুস্থতা আরেকটি হচ্ছে অবসরতা।' (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৪১২)

স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মানুষ ইবাদত করে না। অসুস্থ হওয়ার পর ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হয় না; শরীরে কুলায় না, উযূ ধরে রাখা যায় না। অর্থাৎ নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই যৌবনকালে সুস্থ অবস্থায় ইবাদতের অভ্যাস গড়তে হবে। এর ফায়দা হল, অসুস্থ কিংবা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে পূর্বে কৃত কোন ইবাদত করতে সক্ষম না হলেও 'পেনশন' পাওয়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পূর্বের আমলগুলোর সাওয়াব জারি রাখেন, যা এখন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে।

আর অবসরতাকেও গনীমত মনে করে কাজে লাগাতে হবে। ব্যস্ততা এসে গেলে ইবাদতের সুযোগ থাকে না। বর্তমানে করোনাকালীন অনেকে অবসর সময় কাটাচ্ছে। কাজ নেই বা থাকলেও কম। এই অবসর সময়গুলো টেলিভিশন, নাচ-গান, নাটক-সিনেমা ইত্যাদি দেখে বা মোবাইলে গেমস খেলে পার করবে না। অন্য সময় এতোটা অবসর সচরাচর পাওয়া যায় না। কাজেই এটাকে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে, দীনী কিতাবাদি পড়ার মাধ্যমে, পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে দীনী মুযাকারার মাধ্যমে, বেশি বেশি নফল নামায পড়ে এবং বেশি বেশি নফল রোযা রেখে কাটাবে। ফালতু কাজে কিংবা গুনাহের কাজে কাটাবে না।

মহামারীতে আতংক নয় আশান্বিত হওয়া উচিৎ

আমরা তো মহামারীর কথা শুনলে মৃত্যুর ভয়ে পালাই। অবশেষে পালানোর জায়গাও পাই না। অথচ সাহাবায়ে কেরাম মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার জন্য দু'আ পর্যন্ত করেছেন। কেননা সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই জিহাদে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও শহীদ হওয়ার সুযোগ লাভ করেননি। অথচ মহামারীতে মারা গেলেও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী শাহাদাতের মর্যাদা লাভ হয়, জীবনের গুনাহ-খতা মাফ হয়ে যায়, বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়া যায়।

হযরত উমর রাযি.-এর যামানায় একবার মহামারী দেখা দিয়েছিল। ঐ মহামারীর আলামত ছিল, আক্রান্তের শরীরে বিশেষ ধরনের ফোড়া উঠতো। তো একসাহাবীর হাতেও ঐ আলামত দেখা দিল। তিনি বললেন, সারা দুনিয়ার চেয়েও এই ফোড়াটি আমার কাছে অধিক মূল্যবান। কারণ, হয়তো এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। অর্থাৎ তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, মৃত্যু নির্ধারিত সময়েই ঘটবে; এক সেকেন্ড আগেও না, পরেও না। কিন্তু এই মহামারীর উসিলায় যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে বড়ই খোশনসীব! সুবহানাল্লাহ, কী বিস্ময়কর ঈমানী জযবা!

করোনার শিক্ষা

করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে বটে, তবে ফায়দাও হয়েছে বেশ। লকডাউনের কারণে মানুষ ব্যাপকভাবে ঘর থেকে বের হতে পারেনি। ফলে ঘর থেকে বের হয়েই যারা গুনাহের আড্ডায় লেগে যেতো তারা গুনাহ থেকে বেঁচে গেছে। চুলের সঙ্গে দাড়িকাটা যাদের অভ্যাস ছিল, সেলুন বন্ধ থাকায় কিছুদিনের জন্য হলেও এই গুনাহ থেকে বিরত থেকেছে। মদের বার, পতিতালয়, সিনেমা-হল, নাট্যশালা ও নারী-পুরুষের সহাবস্থানকেন্দ্রগুলো বন্ধ থাকায় লাখো মানুষ অগণিত গুনাহ থেকে বেঁচে গেছে।

তাছাড়া পরিবেশগত কিছু উন্নতিও হয়েছে। কল-কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় আবহাওয়া মাত্রারিতিক্ত দূষিত হয়ে পড়েছিল। সবকিছু বন্ধ থাকায় আবহাওয়ারও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অনুরূপভাবে নদীর পানিও কিছুটা দূষণমুক্ত হয়েছে। গবেষকগণ চিন্তা-ভাবনা করলে আরও বহুবিধ বাহ্যিক উপকার অনুধাবন করতে পারবেন। করোনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিক্ষা এই–

শিক্ষা-১: দুনিয়াতে সুপার পাওয়ার বা পরাশক্তি বলতে কিছু নেই। সর্বময় ক্ষমতার মালিক জগৎসমূহের অধিপতি একমাত্র আল্লাহ

সামান্য করোনাভাইরাসের সামনে সুপার পাওয়ার দাবীদাররা জিরো পাওয়ারে পরিণত হয়েছে। যে যতো বড় পরাশক্তির দাবীদার করোনায় সে ততো বেশি বিপর্যস্ত। বিশ্বের সর্বোচ্চ ক্ষমতার দাবীদার ব্যক্তিও অকপটে স্বীকার করছে যে, আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি, কঠিন সময় পার করছি। করোনা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, দুনিয়াতে আমরা যে বিভিন্ন শক্তিকে ভয় পাই এটা অমূলক ও অহেতুক। আল্লাহর কুদরতের সামনে তাদের কোন শক্তি নেই। আল্লাহ যে কোন মুহূর্তে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিস দ্বারা ক্ষমতার সকল দম্ভ মিসমার করে দিতে পারেন।

পৃথিবীতে আজ বড় বড় কতো বাহিনী, কতো যুদ্ধজাহায, কতো যুদ্ধবিমান এবং কতো ট্যাংক-কামান ও গোলা-বারুদ বিদ্যমান। কিন্তু করোনার মোকাবেলায় এগুলো কোন কাজে আসছে না। আল্লাহ তা'আলা কথিত পরাশক্তির দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব চাক্ষুষ দেখিয়ে দিলেন। সুতরাং আমাদের আকীদা-বিশ্বাস ঠিক করে নিতে হবে যে,

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

অর্থ: 'সর্বময় ক্ষমতার অধিপতি একমাত্র মহান আল্লাহ।' (সূরা বাকারা-১৬৫)

অনেকে মনে করে, জনগণই ক্ষমতার উৎস। এটা ভ্রান্তধারণা, ফালতু বিশ্বাস। যদি তাই হবে, তাহলে ক্ষমতার উৎস জনগণ নিজেরাই বেঘোরে মরছে কেন এবং নিজেদের শাসককেই-বা রক্ষা করতে পারছে না কেন?

মূলত বাতাস-পানি, খরা-ভাইরাস এগুলো আল্লাহর এক-একটা বাহিনী। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, কোন এক বাহিনীকে হুকুম করেন– ব্যস মুহূর্তেই সে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। দুনিয়ার কোন ক্ষমতা ও ক্ষমতাদর্পী তার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় না।

শিক্ষা-২: দুনিয়াতেই কিয়ামতের দৃশ্য; কেউ কারো নয়

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

অর্থ: 'অতঃপর যখন আসবে সেই মহাবিপর্যয়। সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই থেকে, নিজ মাতা ও পিতা থেকে, নিজ স্ত্রী ও সন্তান থেকে।' (সূরা আবাসা–৩৩-৩৬) কিয়ামতের দিন যে বিভীষিকাময় দৃশ্যের অবতারণা হবে, করোনা-পরিস্থিতি তার একটা নমুনা ও ঝলক। করোনা পজেটিভ জানা গেলে প্রিয়তমা স্ত্রী, কলিজার টুকরো সন্তান কেউ কাছে ভিড়ছে না; বদ্ধঘরে একাকী ফেলে রাখছে। গর্ভধারীণী মা-কে সন্তানেরা জঙ্গলে ফেলে আসছে। এই যখন অবস্থা তখন আমরা যে মহব্বতের দাবী করি তার কী অর্থ রইল? বলুন, এই স্ত্রী-সন্তানদের জন্য নামায-রোযা বাদ দিয়ে, হালাল-হারাম না মেনে, দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এতো কিছু কেন করছি? যাদের জন্য আল্লাহকে ভুলে গিয়ে এতো কিছু করছি বিপদের সময় তো তারা আমার পাশে থাকছে না। দুনিয়ার এই সামান্য বিপদে যখন এই অবস্থা, তাহলে আখেরাতের কঠিন বিপদে কী অবস্থা হবে? হ্যাঁ, করোনা ভাইরাসের এই চরম ক্রান্তিকালেও শুধুমাত্র দীনদার-পরহেজগার লোকজন পরের সেবায় এগিয়ে এসেছে। করোনায় মৃতদের কাফন-দাফনের ইন্তেজাম করেছে। এর দ্বারা বোঝা গেলো, দীনদার-পরহেজগার লোকেরাই প্রকৃত আপনজন। দুনিয়াতেও তারা এর প্রমাণ পেশ করেছে। ইনশা-আল্লাহ আখেরাতেও তারা সুপারিশ করবে।

শিক্ষা-৩: لا عدوى তথা সংক্রামক ব্যাধি বলতে কোন কিছু নেই

কুরআন-সুন্নাহ সংক্রমণের ব্যাপারটি সমর্থন করে না। কোন কোন হাদীসে যে বলা হয়েছে–

فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

অর্থ: 'কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে পলায়ন করো যেমন সিংহ দেখলে পলায়ন করে থাকো।' (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৯৭২২)– এটা দুর্বল ঈমানদারদের জন্য বলা হয়েছিল। যেন সে আল্লাহর হুকুমে আক্রান্ত হয়ে এ কথা মনে না করে যে, আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যাওয়ার কারণে আমি আক্রান্ত হয়েছি, না গেলে আক্রান্ত হতাম না। কেননা এমনটি মনে করার কারণে তার ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্য হাদীসে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কুষ্ঠরোগীকে নিজের সঙ্গে বসিয়ে একই পাত্র থেকে খানা খেয়েছেন। এই কর্মপদ্ধতি দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, সংক্রমণ বলতে কিছু নেই। বর্তমান বাস্তবতাও তাই। যদি সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব থাকতো তাহলে করোনা চিকিৎসায় নিয়োজিত একজন ডাক্তার-নার্সও করোনা-নেগেটিভ থাকার কথা নয় এবং কোন পরিবারের একজন করোনায়

আক্রান্ত হলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কেউ সুস্থ থাকার কথাও নয়।

শিক্ষা-৪: সর্বদা উযূ অবস্থায় থাকা এবং নামাযী হওয়া।

করোনার আরেকটি শিক্ষা হল, সবাই নামাযী হও। নামায পড়তে হলে উযূ করতে হয়। নিয়মিত পাঁচবার উযূ করলে জীবাণু থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। ডাক্তাররা এখন বারবার শুধু হাত ধোয়া শেখাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূর মাধ্যমে হাত-পা-চোখ-নাক-মুখ তথা শরীরে ভাইরাস প্রবেশের যতগুলো পথ আছে সবগুলো ধোয়া শিখিয়েছেন। কাজেই বর্তমান সময়ে উযূ করা, সর্বদা উযূর সঙ্গে থাকা আত্মরক্ষার বড় হাতিয়ার।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, 'ভাইরাস বাতাসে ভেসে বিভিন্ন পথ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে।' কাজেই শুধু হাত ধোয়ার চলমান পদ্ধতি অসম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে উযূ করার নববী পদ্ধতি যথার্থ ও পরিপূর্ণ কার্যকর।

বিজ্ঞানীরা এক-এক সময় এক-এক কথা বলছেন। একদল সবসময় মাস্ক পরে থাকতে বলছেন; আই প্রটেক্টর ব্যবহার করতে বলছেন। আরেকদল বলছেন, সবসময় মাস্ক পরে থাকলে শ্বাস-প্রশ্বাস বাধাগ্রস্ত হয়, ফুসফুস দুর্বল হয়ে যায়। আবার চোখে আলো-বাতাস না লাগলে চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু নববী পদ্ধতি উযূ অবলম্বন করলে এসব অসুবিধা নেই। তাছাড়া উযূ শুধু নামাযের জন্য নয়, সর্বদা উযূ অবস্থায় থাকারও ফযীলত রয়েছে। তাই বারবার হাত ধোয়ার পরিবর্তে উযূ করে নিন। কারণ এটা মুমিনের হতিয়ার। হতিয়ার সঙ্গে থাকলে শত্রু যেমন অতর্কিত হামলা করতে পারে না, উযূ অবস্থায় থাকলেও রোগ-জীবাণু সহজে আক্রমণ করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষা-৫: কুদরতী নেযামই কার্যকর, ডাক্তারদের মনগড়া নীতি অযথা হয়রানী। সেবার মানসিকতা রাখতে হবে।

ডাক্তারদের খেদমতের মানসিকতা থাকতে হবে। ডাক্তারী পেশার মর্মই হচ্ছে খেদমত। কিন্তু আজকাল ডাক্তারদের মাঝে দীনী শিক্ষা ও চেতনা না থাকার কারণে বেশিরভাগেরই খেদমতের মনোভাব নষ্ট হয়ে গেছে। তারা এটাকে পয়সা কামানোর হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে। অনেক সময় তারা বেশি টাকা কামানোর জন্য বিনা প্রয়োজনে রোগীকে আইসিইউতে পাঠিয়ে দেয়। আবার দেখা গেছে, নিছক বিল বাড়ানোর জন্য রোগী মারা যাওয়ার পরও এক-দুই দিন আইসিইউতে আটকে রেখেছে। আমার এক আত্মীয়ের হার্টের সমস্যা ছিল। ডাক্তার বলেছে, দু'টি রিং পরাতে হবে এবং তার কাছ থেকে দু'টি রিং-এর টাকাও নিয়ে নিয়েছে। কিছুদিন পর যখন আবার সমস্যা দেখা দিল, অন্য হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখা গেল, হার্টে রিং পরানো হয়েছে একটি। আগের ঐ ডাক্তারকে ধরা হল যে, একটি রিং পরিয়ে দু'টি রিং-এর বিল নিলেন কেন? বলল, এটা অনেক দামী রিং; একটাই দু'টোর সমান কার্যকারী, এজন্য দু'টির বিল নেয়া হয়েছে। কি রকম বর্বরতা ও জালিয়াতি!

বর্তমানে বেশিরভাগ ডাক্তারের ধ্যান-ধারণা হল– সন্তান প্রসবের সময় বাধ্যতামূলক সিজার করতে হবে। লকডাউনকালীন আমার পরিবারস্থ একজনের ডেলিভারীর সময় ঘনিয়ে আসল। রোগীকে ভর্তি করার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে যোগাযোগ করা হল। সব হাসপাতালের একই প্রশ্ন– সিজার করবেন? সিজার হলে আছি, নরমালে হলে পারবো না। আশ্চর্য! রোগীর অবস্থা না দেখেই তারা সিজারের সিদ্ধান্ত দিয়ে দিচ্ছে! রোগীকে জবাই করতে সামান্য দ্বিধাবোধ করছে না! এর নাম মানবসেবা!? যাহোক, পরে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে রোগীকে বাসায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আল্লাহর শোকর, তারই মেহেরবানীতে নরমালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে!

করোনার ভয়ে অধিকাংশ হাসপাতাল বন্ধ ছিল। গাইনী ডাক্তাররা রোগী দেখা বন্ধ রেখেছিল। এই সময়ে লক্ষ লক্ষ সন্তান বিনা সিজারে ভূমিষ্ঠ হয়েছে; কোন ডাক্তারের প্রয়োজন হয়নি। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, এটাই কুদরতী নেযাম, এটাই আসল পদ্ধতি; গণহারে সিজার করার প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ

অর্থ: 'অতঃপর তিনি তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পথকে সুগম করে দিয়েছেন।' (সূরা আবাসা-২০)

বলুন তো, হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে এই 'পেটকাটা বিদ্যা' আবিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত কারো কি সিজার করার প্রয়োজন হয়েছে? গরু-ছাগলসহ অন্যান্য প্রাণীর সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য কখনও কি সিজারের দরকার পড়েছে? পড়েনি। তাহলে এখন এসে সিজার বাধ্যতামূলক হয়ে গেল কেন? এটা ডক্তারদের ভুল সিদ্ধান্ত। একান্ত অসুবিধা দেখা দিলে ভিন্ন কথা। ব্যতিক্রম থাকবেই; কিন্তু গণহারে সিজার করা কিছুতেই বোধগম্য নয়! সিজার করা হলে একজন মহিলা সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়। দু'-তিনটির বেশি সন্তান জন্ম দিতে অপারগ হয়ে পড়ে। অথচ নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم

অর্থ: 'তোমরা অধিক সন্তান জন্মদাত্রী স্ত্রীলোককে বিবাহ করো, কেননা কিয়ামতের ময়দানে আমি উম্মতের আধিক্য নিয়ে গর্ব করবো।' (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২০৫০)

যে কাজে আল্লাহ বান্দার উপর খুশি হন

আল্লাহ তা'আলা বান্দার কাছে বিরাট কিছু চান না, শতভাগ নিখুঁত ইবাদত-বন্দেগীও চান না। কেননা সকল বান্দার পক্ষে তা সম্ভবও হবে না। আল্লাহ চান বান্দার বিনয়, কান্নাকাটি আর চোখের পানি। তিনি চান বান্দা নিজেকে খুব ছোট করে তার সামনে পেশ করুক। আল্লাহর খাযানায় কোন কিছুর অভাব নেই; নেই শুধু বিনয় বা ছোট হওয়া। কেননা তিনি সকলের বড়, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সকল কিছুর মালিক; সুতরাং তিনি কার কাছে ছোট হবেন? আর নিয়ম হল, যার কাছে যেটা নেই তাকে সেটা দিলে বেশি খুশি হন। এজন্য আমরা যদি আল্লাহর কাছে আমাদের বিনয় ও কান্নাকাটি পেশ করতে পারি তাহলে তিনি আমাদের ক্রটিযুক্ত আমলগুলো দয়া করে কবুল করে নিবেন। পক্ষান্তরে বিনয় প্রকাশ করতে না পারলে তিনি আমাদের বাহ্যিক নিখুঁত আমলও বাতিল করে দিতে পারেন। এজন্য শুধু বেশি পরিমাণে ইবাদত করলেই যথেষ্ট হবে না; পাশাপাশি বিনয়ের সাথে খুব কান্নাকাটিও জরুরী। যেন তিনি আমাদের কষ্ট করে কৃত ইবাদতগুলো কবুল করে নেন, ফিরিয়ে না দেন। দেখা গেছে, যে বুযুর্গ যতো বেশি ইবাদতগুযার ছিলেন, তিনি ততো বেশি বিনয়ী ছিলেন এবং ততো বেশি কান্নাকাটি করতেন। আল্লাহ তা'আলা সকলকে তাওফীক দান করুন। আ-মীন।

অনুলেখক: মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী
শিক্ষক: জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।
খতীব: শাহীনবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব রহ.-এর মালফূযাত

সংকলক : মুফতী হাসান সিদ্দীকুর রহমান দা.বা.

[রমাযান ১৪২১ হিজরী মোতাবেক ডিসেম্বর ২০০০ ঈসায়ীর মালফূযাত। সংকলকের তৃতীয় ও সর্বশেষ হারদুঈ সফরের সময়।
স্থান : মাদরাসা আশরাফুল মাদারিস হারদুঈ, উত্তর প্রদেশ, ভারত।]

কথা বেশি বলার অপকারিতা

১. মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলেন, কথা বেশি বলার দ্বারা অন্তরের নূর খতম হয়ে যায়।

কোন্‌টা উদ্দেশ্য, ইসলাহ নাকি বাইয়াত?

২. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, ইসলাহ বা সংশোধন হল উদ্দেশ্য। গতানুগতিক বাইয়াত উদ্দেশ্য নয়; বরং খেলাফতের জন্যও বাইয়াত জরুরী নয়।

আল্লাহকে পাওয়াই হল আসল

৩. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হল মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেটা যে কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের মাধ্যমেই হাসিল হোক না কেন।

ইসলাহের গুরুত্ব

৪. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, বর্তমান যুগে ইখলাসের কমতি প্রকট। ইখলাস না থাকলে ইলম দ্বারা উপকার হয় না।

বারবার আসার পরও সংশোধন হয় না কেন?

৫. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, অনেক মানুষ এখানে (হারদুঈ খানকায়) বারবার আসেন। তারপরও তাদের ব্যাপারে নানারকম অভিযোগ আসে। এর কারণ কী? কারণ এটাই যে, ইসলাহ বা আত্মশুদ্ধির প্রতি মনোযোগ নেই।

গুনাহের খেয়াল

৬. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, গুনাহের খেয়াল অন্তরে আসা গুনাহ নয় (খেয়াল অনুযায়ী গুনাহ সম্পাদন করা গুনাহ)।

হিংসা ও ক্রোধ

৭. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, তোমরা হিংসা ও ক্রোধ থেকে খুব সতর্ক থেকো।

কুদৃষ্টির ক্ষতি

৮. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, কুদৃষ্টি করার দ্বারা দৃষ্টি পরিতৃপ্ত হয় না; বরং যন্ত্রণা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

হযরত থানবী রহ. এর গ্রন্থসমূহ

৯. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর কিতাবাদির যে পৃষ্ঠাই খুলবে (রূহানী) স্বাদ অনুভব করবে।

মন্দ স্বভাব বর্জন ও সৎ স্বভাব অর্জনের আলামত

১০. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, মন্দ স্বভাবগুলো দূরীভূত হওয়া এবং প্রশংসনীয় গুণগুলো হাসিল হওয়ার আলামত বা লক্ষণ হল, গুনাহ ছুটে যাবে এবং নেক কাজের তাওফীক নসীব হবে।

আল্লাহর ওলী হওয়ার সবচে' বড় অন্তরায়

১১. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, কেউ গুনাহ করবে আবার আল্লাহর ওলী হবে, এটা কখনোই হতে পারে না।

যিকির-ফিকির

১২. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, ঠোঁটে সবসময় মহান আল্লাহর যিকির জারী রাখতে হবে আর দিলের মধ্যে সর্বদা ফিকিরও থাকতে হবে।

শেখার গুরুত্ব

১৩. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, লোকেরা দীনী কাজগুলো আলেমগণের কাছ থেকে শেখে না; অন্যকে যেভাবে করতে দেখে সেভাবেই করতে থাকে (যা উচিত নয়)।

হযরত থানবী রহ. অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন

১৪. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, হযরত থানবী রহ.-এর বুযুর্গ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে বিদেশী মানুষদেরকেও খেলাফত দিয়েছেন। আবার ক্ষেত্রবিশেষ কোন কোন স্থানীয় ও দেশী ব্যক্তিদেরকে খেলাফত দেয়ার পরও তা বাতিল করে দিয়েছেন।

[*২৯ রমাযান ১৪২১ হিজরী, আসর নামাযের পর*]

নিজে নিজে সংশোধন হয় না

১৫. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, আত্মশুদ্ধির জন্য অবিরাম পরিশ্রম করা চাই। নিজে নিজে সংশোধিত হওয়া যায় না। অন্তরের হালত যতোই খারাপ হোক– চিকিৎসা আরম্ভ করো। গাইরুল্লাহ থেকে অন্তর সাফ করো। ধারাবাহিকতা বজায় রাখো।

দু'আই মূল

১৬. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, দু'আর চেয়ে বড় আমল নেই।

প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক আছে

১৭. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, লোকেরা বলাবলি করে, 'অমুক রোগের কোন চিকিৎসা নেই'। তাদের এ কথার বাস্তবতা নেই। কেননা হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.

অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা যে কোন রোগ নাযিল করেছেন, তার প্রতিষেধকও নাযিল করেছেন।' (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৬৭৮)

প্রশ্ন কেমন হওয়া উচিত

১৮. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, জিজ্ঞাসা যুক্তিনির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চাঁদ কোথায় তালাশ করবে?

১৯. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, সূর্যাস্তের স্থানেই চাঁদ তালাশ করা উচিৎ। অনেকে প্রকৃত স্থান বাদ দিয়ে অন্য স্থানে অনুসন্ধান করে; এটা নির্বুদ্ধিতা।

ইসলাহের একটি পদ্ধতি

২০. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, ইসলাহ বা সংশোধনের এটাও একটা পদ্ধতি যে, প্রথমে গুনাহ বর্জন অতঃপর নেক আমলের দ্বারা সুসজ্জিতকরণ। যেমন, দেয়াল ইত্যাদি রং করার সময় প্রথমে ঘষেমেজে ময়লা দূর করা হয়, এরপর রং করা হয়। তাসাওউফের পরিভাষায় এটাকে (প্রথমে) 'তাখ্‌লিয়া' (অতঃপর) 'তাহ্‌লিয়া' বলা হয়।

ক্ষমা করার পরও অনেক সময় অন্তরে বিষণ্ণতা থাকে

২১. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, মানুষ ক্ষমা চাইলে সাধারণত ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিন্তু অনেক সময় কারো কারো ব্যাপারে অন্তরে বিষণ্ণতা ও সংকোচ থেকেই যায়। যেমনটি হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে হযরত ওয়াহ্‌শী ইবনে হারব রাযি.-এর ব্যাপারে। এর মধ্যে হযরত ওয়াহ্‌শীরই ফায়দা ছিল।

[*১৪২১ হিজরী ঈদের রাতে*]

'কিয়ামুল লাইল' দ্বারা তাহাজ্জুদ উদ্দেশ্য

২২. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم وهو
قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للاثم

অর্থ : 'তোমরা কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের ইহতিমাম করো। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎলোকদের অভ্যাস এবং তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের উপলক্ষ, অপরাধ-সমূহের কাফফারা এবং গুনাহের জন্য প্রতিবন্ধক।' (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৫৪৯)

এ জন্য বিতর নামাযের পূর্বে চার, আট বা বারো রাকা'আত তাহাজ্জুদের নিয়তে আদায় করুন এবং সর্বশেষে বিতর আদায় করুন।

যুহরের পূর্বে নফল নামাযের ফযীলত

২৩. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, যদি কেউ যুহর নামাযের পূর্বে চার বা আট রাকা'আত আদায় করে, আমি তো বলি, এর দ্বারাও তাহাজ্জুদের ফযীলত হাসিল হবে ইনশাআল্লাহ।

তাহাজ্জুদের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পরিমাণ

২৪. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, তাহাজ্জুদের ন্যূনতম পরিমাণ হল দুই রাকা'আত। আর সর্বোচ্চ পরিমাণ হল বারো রাকা'আত।

তারাবীহর বরকতে অনেক মানুষ তাহাজ্জুদেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. বলেছেন, 'ইশার নামায সুন্নাহ অনুযায়ী আদায় করার পর যদি রাতে চোখ খুলে যায়, তাহলে কমপক্ষে তিন বার সুবহানাল্লাহ পড়ে নাও'।

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. লিখেছেন, 'যে ব্যক্তি ইশার পরপরই শুয়ে পড়বে, ঐ ব্যক্তির অবশ্যই তাহাজ্জুদ নসীব হবে'।

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.

অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই চান, তোমাদের জন্য জটিলতা চান না।' (সূরা বাকারা-১৮৫)

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

অর্থ: 'দীন হল সহজ।' (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৯)

সুতরাং তাহাজ্জুদ পড়া কোন মুশকিল কাজ নয়।

এ প্রসঙ্গে খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব রহ.-এর অপূর্ব কবিতা–

تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے،
تو ہی ہمت ہار ہے ہاں تو ہی ہمت ہار ہے۔
ہر قدم پر تو جو رہرو کھا رہا ہے ٹھوکریں،
لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے۔

কাব্যানুবাদঃ

ইশকের পথে হাঁটা-চলা তব
বড়ই কঠিন হয় অনুভব!
তুমিই ভীরু, হিম্মতহারা,
অহেতুক ডরো, নেই শিরদাঁড়া।
পথে পথে শুধু খাচ্ছো হোঁচট,
প্রতি কদমেই পাচ্ছো যে চোট,
তোমার পায়েই অচলতা-দোষ,
নচেৎ এ পথে হেঁটেছে মানুষ।
মিছে কেন দাও পথেরে লানত?
পথ মসৃণ ছিল আলবত!

সীরাতের কিতাব পাঠ করার বরকত

২৫. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, আমাদের এখানে ঈদের রাতে সীরাতের কিতাবও পাঠ করা হয়। সীরাতের কিতাবের বরকতে প্লেগ, মহামারী ও বিপদাপদ দূর হয়ে যায়; এটা অভিজ্ঞতার কথা।

[*১লা শাওয়াল ১৪২১ হিজরী মোতাবেক ২৮ ডিসেম্বর ২০০০ ঈসায়ী ঈদের দিন*]

প্রতিটি বস্তুর যথাযথ মূল্যায়ন জরুরী

২৬. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, হাতিকে হাতি আর ছাগলকে ছাগলই মনে করা উচিৎ।

যোগ্য ইমাম নির্বাচন করা উচিৎ

২৭. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, বুঝে আসে না– লোকেরা ডাক্তার, মাস্টার প্রমুখ ভালো দেখে নির্বাচন করে কিন্তু আশ্চর্য, ইমাম ভালো দেখে নির্বাচন করে না! এ প্রসঙ্গে খাজা ছাহেব রহ.-এর কবিতা–

اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے،
دین میں کیوں پھر تو اتنا سست ہے۔

কাব্যানুবাদঃ

দুনিয়া তো বোঝো ভাই পুরো ষোলআনা,
দীনের ব্যাপারে কেনো ল্যাংড়া ও কানা!

আমলের শক্তি কিভাবে সৃষ্টি হয়?

২৮. হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন, আমলের শক্তি কিভাবে সৃষ্টি হয়? আমলের শক্তি সৃষ্টি হয় মহব্বত বা ভয়ের কারণে। এটাকেই খাজা ছাহেব রহ. এভাবে বলেছেন–

ہو اگر وقت سحر قصد شکار،
رات بھر رہتا ہے تجھ کو انتظار۔
آنکھ کھل جاتی ہے بار بار،
اور نماز فجر کا پڑھنا ہے بار۔

কাব্যানুবাদঃ

প্রভাতকালে শিকার করার
খায়েশ যদি থাকে মনে,
কাটে তোমার ভর-রজনী
প্রতীক্ষারই প্রহর গোণে,
চক্ষু তোমার যেই-না মুদে
অমনিই খোলে পরক্ষণে!
সেই তোমারই ফজর নামায
ভীষণ বোঝা মনের কোণে!

সংকলক পরিচিতি: সিনিয়র মুদাররিস; জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। খতীব; লেকসার্কাস জামে মসজিদ, কলাবাগান, ঢাকা।

২ পৃষ্ঠার পর : সম্পাদকীয়

অর্থঃ যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে বিশ্বাস রাখে তাদেরকে তুমি এমন পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখছে। হোক না সেই বিরুদ্ধাচারী তাদের পিতা, পুত্র, ভাই কিংবা তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। তারাই এমন আল্লাহ যাদের অন্তরে ঈমানকে খোদাই করে দিয়েছেন এবং নিজ রূহ তথা ফেরেশতা দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো! আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। (সূরা মুজাদালা-২২)

এই আয়াতের আলোকে একথা স্পষ্ট যে, যে কেউ নিজেকে মুমিন-মুসলমান দাবী করলে এবং কিছু ইবাদাত-বন্দেগী করে নিলেই তাকে প্রকৃত ঈমানদার গণ্য করা হবে না এবং সে ঈমানের সুফলও পাবে না। বরং বে-ঈমান ও ইসলাম-বিদ্বেষীদের সঙ্গে বিরোধ পোষণ করাও ঈমানের জন্য জরুরী। সুতরাং কাজে-কর্মে মিল রেখে শুধু মৌখিকভাবে 'বিরোধ করি' বললে যেখানে বিরোধিতা হয় না সেখানে মুখেও যদি কেউ কুলুপ এঁটে রাখে, বেয়াদব কাফেদের বিরুদ্ধে টু-শব্দটিও না করে তাহলে তাকেও কি কাফের-বিরোধী বলার সুযোগ আছে?

এখানেই শেষ নয় বরং কাফেরদেরকে কাফের বলা, আল্লাহ ও রাসূলের অস্বীকারকারীদেরকে মুসলিম জাতি ও বিশ্বসভ্যতার দুশমন ও পশুর চেয়ে অধম বলাও নাকি ভদ্রতার খেলাফ এবং একধরনের উগ্রতা! বলুন, এমন চিন্তাধারার লোকেরাও কি প্রকৃত মুসলমান? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন মুসলমানের দলভুক্ত হওয়া এবং সমর্থক হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আ-মীন।

এই দুঃসাহস অসহ্য! এই ধৃষ্টতা অমার্জনীয়!!

মাওলানা আব্দুল হান্নান

চলতি বছরের ষোলই অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিস নগরীর শহরতলীতে গলা কেটে হত্যা করা হয় এক স্কুলশিক্ষককে। কুলাঙ্গার এই স্কুলশিক্ষক– আমাদের নয়নের মণি, হৃদয়ের স্পন্দন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে শ্রেণীকক্ষে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করেছিল। শিক্ষার্থী ও অভিভাবক কর্তৃক ন্যায়সঙ্গত আপত্তি-অভিযোগ সত্ত্বেও এই দুর্ভাগা– রাসূলের শানে গোস্তাখী অব্যাহত রাখে। সেক্যুলার স্কুল কর্তৃপক্ষও ব্যাপারটি আমলে নেয়নি। অবশেষে এক তরুণ রাসূলপ্রেমিক এই বেয়াদবের পাওনা চুকিয়ে দেয় এবং তাকে হত্যা করে। চেচেন বংশোদ্ভূত এই সাহসী রাসূল প্রেমিকের বয়স মাত্র ১৮ বছর! পুলিশ ঘটনাস্থলেই তাকে শহীদ করে দেয়।

ঘটনার পর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ নিহত শিক্ষকের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয় এবং নিজে উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে। এরপর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকটি ভবনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয় নবীজীর ব্যঙ্গচিত্র! ম্যাক্রোঁ ঘোষণা দেয়, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিতর্কিত কার্টুন ছাপানো নিয়ে তারা নিন্দা জানাবে না; বরং বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবে তারা এর প্রদর্শনী অব্যাহত রাখবে। একইসঙ্গে নিহত শিক্ষকের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। ফলে স্থানীয় মুসলমান ও দীনী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর শুরু হয় রাষ্ট্রীয় নির্যাতন ও ব্যাপক ধরপাকড়।

ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষ ফ্রান্সের পুরনো পাপ

এটাই প্রথম নয়, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ফ্রান্সের রয়েছে মজ্জাগত আক্রোশ। বস্তুত ফ্রান্স কোনকালেই মুসলমানদের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন ছিল না। ক্রুসেড তথা মুসলিম ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিলো ফ্রান্স থেকে! ক্রুসেডের প্রথম ডাক এসেছিলো ফ্রান্স থেকে! ক্রুসেডের প্রথম বাহিনীটিও এসেছিলো ফ্রান্স থেকে! খ্রিস্টানদের হয়ে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ক্রুসেডের নেতৃত্ব দেয় সে-ও ছিল ফরাসী; পোপ দ্বিতীয় আরবান। ১০৯৬ থেকে ১২৯১ ঈসায়ী পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান অধিকাংশ ক্রুসেডে নেতৃত্ব দিয়েছে ফরাসীরা; গডফ্রে ও সম্রাট অগাস্টাস এদের উল্লেখযোগ্য। ফরাসী সেনাপতি রেইনল্ড সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের হজ্জ-কাফেলাগুলোর উপর হামলা করে তাদেরকে হত্যা করতো এবং অর্থ-সম্পদ লুট করে নিতো। এমনকি এই নরাধম কয়েকবার মক্কা-মদীনা শরীফ ধ্বংস করারও উদ্যোগ নিয়েছিল! হিত্তিনের যুদ্ধে সালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহ.-এর কাছে যুদ্ধবন্দী হয় রেইনল্ডসহ বহু ফরাসী নেতৃবৃন্দ। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহ. রেইনল্ডকে তার পূর্বের অন্যায়-অপকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও লজ্জিত হওয়ার সুযোগ দেন। কিন্তু সে ক্ষমা না চেয়ে উপস্থিত নবীজীর শানে কটূক্তি করতে থাকে। নবীপ্রেমিক সালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহ. সঙ্গে সঙ্গে এই কুলাঙ্গারের ইহলীলা সাঙ্গ করে দেন এবং বলেন, 'এক রাজা আরেক রাজাকে হত্যা করে না; কিন্তু সে সীমালঙ্ঘনকারী।'

ফ্রান্স গত শতাব্দীতে আফ্রিকান মুসলানদের সভ্য (?) বানানোর নামে আলজেরিয়া, মরক্কো, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, সেনেগাল, মালি, চাঁদ, নাইজার, লেবানন, মৌরিতানিয়া, গাম্বিয়া ও গিনিতে গণহত্যা চালায় এবং ৫০ লক্ষাধিক মুসলমানকে হত্যা করে। এসব ভূখণ্ড থেকে ফ্রান্স এখনো মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে মালি, নাইজার, চাঁদ, টোগো, বেনিন ও কঙ্গোর খনিগুলো থেকে স্বর্ণ, ডায়মণ্ড, আয়রন ও পেট্রোলিয়ামসহ নানা রকম খনিজ সম্পদ একচেটিয়াভাবে উত্তোলন ও লুট করে নিচ্ছে ফ্রান্স। সাবেক ফরাসী প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেঁরা ১৯৫৭ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল– আফ্রিকার (সম্পদের) উপর নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখতে না পারলে একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ফ্রান্সের জায়গা থাকবে না। পাঁচ দশক পর আরেক প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাকও ২০০৮ সালে সেকথার পুনরাবৃত্তি করেছে– 'আফ্রিকা (এর সম্পদ) না থাকলে ফ্রান্স তৃতীয় বিশ্বের তালিকা থেকে ছিটকে পড়তো!'

ইসলামী ইতিহাসের সর্বশেষ খেলাফতব্যবস্থা উসমানী সালতানাতেরও অন্যতম শত্রু ছিলো ফ্রান্স। উসমানী সালতানাত বিলুপ্তির পেছনে ফ্রান্সের ছিল সর্বাত্মক ভূমিকা। ন্যাটো সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলিম-হত্যাকাণ্ডও ঘটিয়েছে ফ্রান্স। ইউরোপে সর্বপ্রথম নিকাব/হিজাব নিষিদ্ধকারী দেশও ফ্রান্স। ২০১৯ সালে ফ্রান্সেই সবচেয়ে বেশি ইসলামোফোবিয়া ও বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে। বছর পাঁচেক আগেও ফ্রান্সের কুখ্যাত পত্রিকা শার্লি এবদো নবীজীর ব্যঙ্গকার্টুন প্রকাশ করে। তখনও মুসলিম উম্মাহর নিন্দা ও প্রতিবাদের পরোয়া না করে ফ্রান্স সরকার শার্লি এবদোর পক্ষ নেয়। মোটকথা, ফ্রান্স ইসলাম ও মুসলমানদের পুরনো শত্রু। ফরাসীরা সর্বদাই ইসলাম ও মুসলমানদের নির্মূল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলজেরিয়ান শায়খ বশীর ইবরাহিমী রহ.-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য– 'ফ্রান্স তোমাদেরকে নিজেদের চিরশত্রু বিবেচনা করে। তারা তোমাদের শত্রুতায় সারাক্ষণ নিমগ্ন থাকে। যদি এক হাজার বছর পরও তোমাদের ব্যাপারে তাদের অবস্থান জানতে চাও– দেখবে, তারা সেই একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে অটল, অবিচল; তোমাদেরকে এবং তোমাদের দীনকে মিটিয়ে দেয়াই তাদের প্রধান লক্ষ্য।'

মুসলিমবিশ্বে নিন্দার ঝড়

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে কার্টুন প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় উক্ত অপকর্ম অব্যাহত রাখায় মুসলিমবিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ফ্রান্স সরকারের এই অমার্জনীয় ধৃষ্টতায় ফুঁসে উঠেছে মুসলিমবিশ্ব। দেশে দেশে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ ও নিন্দার ঝড়। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তুরস্ক সরকার এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান ফরাসী প্রেসিডেন্টের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, 'ম্যাক্রোঁ নামের এই ব্যক্তির ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে সমস্যা কী? এই রাষ্ট্রনেতাকে মানসিক রোগী ছাড়া আর কী বলা যায়, যিনি বিশ্বাসের স্বাধীনতা বোঝেন না এবং তার দেশে বসবাসরত কয়েক মিলিয়ন ভিন্নবিশ্বাসের অনুসারীদের সঙ্গে এমন আচরণ করেন? ওর আসলেই মানসিক চিকিৎসা প্রয়োজন।'

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন, 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান ও পুরনো নানাবিধ অপরাধের প্রতিশোধ-স্বরূপ লক্ষ লক্ষ ফরাসীদের হত্যা করার অধিকার আছে মুসলমানদের।'

ওআইসির পক্ষ হতে বলা হয়েছে, 'আমরা নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম ধর্মের প্রতীকসমূহের অবমাননা করে মুসলমানদের অনুভূতিতে ধারাবাহিক আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাই। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে ধর্মীয় অনুভূতির অবমাননা ও কটূক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।' ইসলাম অবমাননার পক্ষে ফরাসী প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর নেয়া শক্ত অবস্থানেরও সমালোচনা করেছে ওআইসি।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও ম্যাক্রোঁর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্যারিস থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নিতে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাবও পাস করা হয়। এদিকে লেবাননের দারুল ইফতার মহাসচিব আমীন কুরদী এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ফরাসী প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর কটূক্তি মানুষের মধ্যে কেবল ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াবে।'

আরববিশ্বের প্রথিতযশা আরেক আলেম আল্লামা শরীফ হাতেম বলেছেন, 'ফ্রান্স সরকার মুসলমানদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। তারা যেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে যে, হয় তোমরা তোমাদের নবীকে দেয়া গালি মেনে নাও আর নয়তো নিজেদেরকে সন্ত্রাসী স্বীকার করো! সত্য বলতে কি, ফ্রান্স আবারও মধ্যযুগে ফিরে যাচ্ছে; এবার খ্রিস্টধর্মের গির্জার কাঁধে ভর করে নয়, সেক্যুলারিজম নামক ধর্মের কাঁধে সওয়ার হয়ে– যার বর্তমান পাদ্রী ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।'

ফ্রান্সে ক্রমবর্ধমান ইসলাম বিদ্বেষ নিয়ে কুয়েতেও নিন্দার ঝড় উঠেছে। ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন কুয়েতের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রধান মারজুক আল-গানেম। এক সংবাদ সম্মেলনে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামসহ বিশ্বের সব ধর্ম ও বিশ্বাসের অবমাননা বন্ধে জরুরী উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানান তিনি। বাকস্বাধীনতার নামে চরমপন্থা প্রতিরোধে মুসলিম-বিশ্বের কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির আহ্বান করেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমদ আল-ফজল। ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দাবীর প্রেক্ষিতে ২৫-২৯ অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য 'ফ্রান্স-কাতার সাংস্কৃতিক সপ্তাহ' পালন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়। পশ্চিমা-তাবেদার সৌদী প্রশাসনও সীমিত পরিসরে নিন্দা জানিয়ে দায়মুক্তির চেষ্টা করেছে।

পণ্য বর্জনের হিড়িক

শুধু মৌখিক নিন্দার মধ্যেই প্রতিবাদ সীমিত রাখেনি মুসলিমবিশ্ব। ফ্রান্সের সব ধরনের পণ্য বর্জন শুরু করেছে কাতারের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানী আল-মিরাহ কনজ্যুমার গুডস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় বড় মার্কেট ও শপিংমল থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে ফ্রান্সের পণ্যসামগ্রী। আরব দেশগুলোও ব্যাপকভাবে ফরাসীপণ্য বয়কট করেছে। কুয়েত ও জর্ডানের বেশিরভাগ দোকান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে ফরাসীপণ্য। লিবিয়া, সিরিয়া ও গাজা ভূখণ্ডেও বিক্ষোভ-প্রতিবাদের পাশাপাশি ফরাসীপণ্য বিশেষত প্রসাধন-সামগ্রী ও সুগন্ধি বিক্রি করা হচ্ছে না; শপিংমল ও দোকানের তাকগুলো খালি করে দেয়া হচ্ছে। 'আমি ফরসীপণ্য বর্জন করলাম আপনিও করুন' লেখা ব্যানার-ফেস্টুন সবখানে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সৌদী আরবেও সাধারণ মানুষদের পক্ষ থেকে ডাক দেয়া হয়েছে পণ্যবয়কটের।

মুসলিমবিশ্বের বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ফরাসী পণ্যবর্জনের ডাক

বর্তমান পরিস্থিতিতে ফ্রান্স বিষয়ে বিশ্ব-মুসলিমের করণীয় সম্পর্কে বিখ্যাত উলামা ও ইসলামিক স্কলারগণ পণ্যবয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন। উদাহরণত–

আরববিশ্বের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা ইউসুফ কারযাবী লিখেছেন, 'মুসলিম উম্মাহর পক্ষে এটি কখনো সম্ভব নয় যে, তারা তাদের নবীর হক আদায়ে গড়িমসি করবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আমাদের সবকিছুর চেয়ে প্রিয়। আমি কিভাবে এমন জাতির পণ্য ক্রয় করবো, যারা আমার নবীকে অপমান করে? কিভাবে আমরা আমাদের সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দিবো এবং কিভাবে আমাদের সম্পদ দ্বারা তাদেরকে লাভবান হতে দিবো? না, এটা কিছুতেই হতে পারে না। তাদের উৎপাদিত পণ্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমাদেরকে বিকল্প পণ্য ব্যবহার করতে হবে।'

বিশ্ববিখ্যাত আলেম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এক টুইটবার্তায় লিখেছেন– 'দো-জাহানের বাদশাহ হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ফ্রান্স এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, তার পরেও কি কোনো মুসলমানের পক্ষে এটা সম্ভব যে, দেশটির (ফ্রান্সের) পণ্য কেনাবেচা বা আমদানী-রপ্তানী করবে! এই সম্পদপূজারীদের তখনই উচিত শিক্ষা হবে যখন ইসলামীবিশ্ব তাদের পণ্য বয়কট করবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এটা সর্বনিম্ন প্রতিক্রিয়া, যা আমরা এই মুহূর্তে দেখাতে পারি।'

বিশ্ববিখ্যাত দাঈ ও আলেম মাওলানা তারিক জামিল তার টুইটবার্তায় লিখেছেন– 'রাসূলে আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করায় সব মুসলিমের হৃদয় ব্যথিত। আমি প্রত্যেক মুসলিম ভাইকে ফ্রান্সের পণ্য বর্জন করার আহ্বান জানাচ্ছি। পণ্যবয়কট আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে এই বস্তুপূজারীদের ভোগবিলাসে আপনি একটা হলেও আঘাত করতে পারেন। নিজের সাধ্য অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলমান ফ্রান্সের পণ্য বয়কটকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিন।'

এ ছাড়াও ফ্রান্সের পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্ক, সৌদী আরব, কাতার, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, কুয়েত ও ইরানসহ মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও ইসলামিক স্কলারগণ।

পণ্যবর্জন এক কার্যকর হাতিয়ার

পণ্যবর্জনকে অনেকে হালকাভাবে দেখে থাকে। বাস্তবে পণ্যবর্জন হালকা কিছু নয়; বরং এক মারাত্মক হাতিয়ার। এর মাধ্যমে বস্তুবাদীদের অর্থনৈতিক প্রাসাদ ধ্বসিয়ে দেয়া সম্ভব। উদাহরণত ২০০৪ সালে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে মুসলিমবিশ্বের পণ্যবয়কট তাদের অর্থনীতিতে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চলমান পণ্যবয়কট যদি কয়েক মাসও দীর্ঘ হয়, তাহলে এটা ওদের আস্ফালন দমিয়ে দিবে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, প্রথম সপ্তাহের এই সীমিত পণ্যবয়কটে ফ্রান্সের শেয়ার বাজারে বিপর্যয় নেমে এসেছে; লোকসান হয়েছে ২৮ বিলিয়ন ডলার। ভেবে দেখুন, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ যদি সচেতনতার সঙ্গে ফরাসী পণ্য বয়কট অব্যাহত রাখে তাহলে ধৃষ্ট ফ্রান্স সরকার কতোটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে!

পণ্যবয়কট ঈমানের দাবী

পণ্যবয়কট ও এর কার্যকারিতার ইতিহাসও অনেক পুরনো। হযরত ছুমামা ইবনে উসাল রাযি.। ইসলামের ইতিহাসে 'পণ্যবয়কটের জনক' নামে পরিচিত। ইয়ামামা অঞ্চলের হানীফা গোত্রের সর্দার ছিলেন। যুদ্ধবন্দী হয়ে মদীনায় আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নবীজীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে উমরা সম্পন্ন করতে মক্কা গমন করেন। মক্কাবাসীরা তাকে

দেখে হৈ-হৈ করে ওঠে– আরে, তুমি তো বে-দীন হয়ে গেছো! তিনি বললেন, না; বরং আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! এখন থেকে ইয়ামামা হতে তোমাদের কাছে যবের একটা দানাও পৌঁছবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূল অনুমতি দেন! (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৩৭২)
ইয়ামামা মক্কাবাসীদের খাদ্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত ছিল। হযরত ছুমামা রাযি. তাদের সঙ্গে বয়কটের ঘোষণা দিলেন। ইয়ামামা থেকে খাদ্যপণ্য আসা বন্ধ হয়ে গেল। আমদানী-নির্ভর মক্কায় খাদ্য-দ্রব্যের প্রচণ্ড অভাব দেখা দিলো। বাধ্য হয়ে মক্কার প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশ কামনা করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ছুমামাকে বয়কট প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন। ইসলামের সূচনালগ্নে হযরত ছুমামার এই পণ্যবয়কট কুরাইশ কাফেরদের ঝাঁজ কমিয়ে দিয়েছিল। বর্তমানে কুরাইশের ভূমিকায় অবতীর্ণ ফ্রান্সকেও পণ্যবয়কটের মাধ্যমে সমুচিত জবাব দেয়া মুসলিম উম্মাহর অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ

ফ্রান্সের এই জঘন্য বেয়াদবী ও সীমাহীন ধৃষ্টতার নিন্দা-প্রতিবাদে পিছিয়ে নেই নবীপ্রেমিক বাংলাদেশও। ঘটনার পর থেকে সারাদেশে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে আশেকে রাসূলগণ। এসব বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করছেন দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমান। ইতোমধ্যে কয়েক দফায় পালিত হয়েছে ফ্রান্স দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচী। বাধা-বিপত্তি ও রাষ্ট্রীয় অসহযোগিতা কোন কিছুই রাসূলপ্রেমিক জনতাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। একটি নমুনা পেশ করা যাক–
ইসলামপ্রিয় জনসাধারণের প্রিয় সংগঠন হেফাজতে ইসলাম। ২ নভেম্বর সোমবার ফ্রান্স দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল। কর্মসূচীটি ছিল ছোট পরিসরে ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক। ঈমানের দাবীর প্রতি সম্মান জানিয়ে শরীক হয়েছিল অগণন মানুষ। ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের রাসূলপ্রেমিকগণ সকাল থেকেই ছুটতে শুরু করেছিলেন বাইতুল মুকাররম অভিমুখে। বেলা চড়তেই কানায় কানায় ভরে ওঠে বাইতুল মুকাররম, পল্টন, প্রেসক্লাস, বিজয়নগর, মতিঝিল, গুলিস্তানসহ আশপাশের প্রধান সড়ক ও অলিগলি। সকাল নয়টার আগেই ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপে দুই-তিন কিলোমিটার দূর থেকে রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। দুপুরের একটু আগে দূতাবাস ঘেরাও মিছিল শুরু হয়। মিছিল তো নয় যেন বাঁধভাঙা জোয়ার। যতদূর চোখ যায় মানুষ আর মানুষ। তরঙ্গের মতো এগিয়ে চলছে। বিক্ষুব্ধ ও তেজোদীপ্ত। অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য। যেন সব জঞ্জাল-আবর্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এরা নবীপ্রেমিক, রাসূল-অনুরাগী। ছুটে চলেছেন নবীজীর ভালোবাসার প্রমাণ দিতে। নবীজীর সম্মান তাদের কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে। পিতা মাতা, স্ত্রী-সন্তান এমনকি আপন প্রাণের চেয়েও। তাদের নিযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল–

নারায়ে তাকবীর; আল্লাহু আকবার
বিশ্বনবীর অপমান; সইবেনারে মুসলমান
বিশ্বনবীর স্মরণে; ভয় করি না মরণে
ফ্রান্সের দূতাবাস; বন্ধ করো, করতে হবে
ফ্রান্সের পণ্য; বর্জন করো, করতে হবে

সে এক মহাবজ্রধ্বনি, গণবিস্ফোরণ। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলা সেই মহাগর্জন যে শোনেনি, তাকে লিখে বোঝানোর সাধ্য নেই।

কুরআনে বর্ণিত গোস্তাখে রাসূলের শাস্তি

কুরআনুল কারীমে গোস্তাখে রাসূলের শাস্তি প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে– (অর্থ:) 'নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানকর শাস্তি'। (সূরা আহযাব-৫৭)
পরবর্তী আয়াতে এসব অভিশপ্তদের পার্থিব শাস্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে– (অর্থ:) 'অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করা হবে এবং হত্যা করা হবে। যারা পূর্বে গত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারেও এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না।' (সূরা আহযাব-৬১, ৬২)
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– (অর্থ:) আর তারা যদি চুক্তি সম্পন্ন করার পর নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং 'তোমাদের দীনের নিন্দা করে' তবে কুফরের এই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করবে। বস্তুত এরা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নেই। (সূরা তাওবা-১২)
আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে 'তোমাদের দীনের নিন্দা করে' অংশের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আয়াতের এই অংশ দ্বারা যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় বা ইসলামের ব্যাপারে অশালীন মন্তব্য করে, তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর; সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

হাদীসে বর্ণিত গোস্তাখে রাসূলের শাস্তি

হযরত আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– (অর্থ:) 'যে ব্যক্তি নবীকে গালি দেয়, তাকে হত্যা করো। আর যে সাহাবীকে গালি দেয়, তাকে বেত্রাঘাত করো।' (দায়লামী; হা.নং ৫৬৮৮)
হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– (অর্থ:) 'কাব ইবনে আশরাফের ব্যাপারটি কে দেখবে? সে-তো আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়! তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান আমি তাকে হত্যা করি? নবীজী বললেন, হ্যাঁ।' (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪০৩৭)
হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ রাখা ছিল। তিনি তা মাথা থেকে খুলে রাখলেন। এমন সময় একব্যক্তি এসে বলল, ইবনে খাতাল তো কাবার গিলাফ ধরে বসে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে হত্যা করে দাও। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮৪৬)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে খাতালকে কাবার গিলাফ ধরা অবস্থায়ও কেন হত্যার নির্দেশ দিলেন? আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারী গ্রন্থে উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে এর কারণ বলেছেন যে, ইবনে খাতাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দ করতো। (ফাতহুল বারী ২/২৪৮)
ইবনে খাতালের দু'টি ক্রীতদাসী ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুৎসামূলক কবিতা আবৃত্তি করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তাদেরকেও হত্যা করার নির্দেশ দেন। (আসাহ্হুস সিয়ার পৃ. ২৬৬, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৪/৪৯৮)
হযরত আলী রাযি. বলেন, এক ইয়াহুদী মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগাল করতো, মন্দ কথা বলতো। একব্যক্তি তার গলা চেপে ধরে, ফলে সে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহিলার রক্তপণ 'বৃথা' ঘোষণা করেন। (সুনানে আবূ দাঊদ; হা.নং ৪৩৬২)

গোস্তাখে রাসূলের ব্যাপারে উলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

মুজতাহিদ ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যে কেউ আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারে কটূক্তি করবে, গালাগালি করবে, অসম্মান করবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আবূ বকর ইবনুল মুনজির রহ. বলেন, সমস্ত আহলে ইলম একথার উপর একমত যে,

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগাল করবে, বা মন্দ বলবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। ইমাম মালেক ইবনে আনাস, ফকীহ আবুল লাইস, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম ইসহাকও এ মতের প্রবক্তা। আর এটাই ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মাযহাব। আল্লামা কাযী ইয়ায বলেন, একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবূ হানীফা রহ., সুফিয়ান সাওরী ও আহলে কুফা। ইমাম আওযায়ী থেকেও গোস্তাখে রাসূলের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে হত্যা করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সুহনুন বলেন, উলামায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগালকারী ও তার কুৎসাকারীদের কাফের হওয়ার উপর ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন। এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহর শাস্তি ও ধমক রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তির কাফের হওয়া এবং শাস্তিযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে সে-ও কুফরীতে লিপ্ত। ইমাম আবূ সুলাইমান খাত্তাবী বলেন, আমি এমন কোন মুসলমানের ব্যাপারে জানি না, যে কিনা গোস্তাখে রাসূলকে হত্যার আবশ্যকতার ব্যাপারে মতবিরোধ করে। (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন ১/৪৮৬-৪৮৭)

প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিলেও ধর্মদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

শুধু ইসলামে নয় ইয়াহুদী ও খ্রিস্টধর্মেও মুরতাদ বা ধর্মদ্রোহীর রয়েছে মৃত্যুদণ্ডের বিধান। নানা রকম হস্তক্ষেপ ও বিকৃতির পরও বর্তমানে তাওরাত, ইনজিল, বাইবেল ও কিতাবুল মোকাদ্দাস নামে যেসব গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেগুলোতেও ধর্মদ্রোহীর কঠোর শাস্তি বিবৃত হয়েছে।

প্রচলিত তাওরাতে ধর্মদ্রোহীর শাস্তি

'৬,৭: দুনিয়ার এক সীমানা থেকে অন্য সীমানা পর্যন্ত তোমার কাছে বা দূরের লোকেরা যে দেব-দেবীর পূজা করে, যারা তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের অজানা সেই সব দেব-দেবীর দিকে যদি তোমার নিজের ভাই কিংবা তোমার ছেলে বা মেয়ে কিংবা প্রিয় স্ত্রী কিংবা তোমার প্রাণের বন্ধু তোমাকে একা পেয়ে বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে, 'চল আমরা গিয়ে দেব-দেবীর পূজা করি'। ৮: তবে তার ডাকে সাড়া দিও না বা তার কথায় কান দিয়ো না। তাকে কোন দয়া দেখাবে না। তাকে রেহাই দিবে না। কিংবা তাকে রক্ষা করবে না। ৯: তাকে হত্যা করতেই হবে। তাকে হত্যা করবার কাজ তুমি নিজের হাতেই শুরু করবে। তারপর অন্য সবাই যোগ দেবে। ১০: যিনি তোমাকে মিসর দেশের গোলামী থেকে বের করে এনেছেন তোমার সেই মাবুদ আল্লাহর দিক থেকে সে তোমাকে ফিরাবার চেষ্টা করেছে বলে তাকে তুমি পাথর ছুড়ে হত্যা করবে। ১১: তাতে বনি ইসরাঈল সকলে সেই কথা শুনে ভয় পাবে এবং তোমাদের মধ্যে কেউ আর এই রকম খারাপ কাজ করবে না।' (বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দাস-২৪২, তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ১৩: ৬-১)

খ্রিস্টধর্মেও মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মুরতাদ হওয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। হত্যা এবং যিনাকারীর স্থলাভিষিক্ত। (এনসাইক্লোপিডিয়া, রিলিজিওন অধ্যায়, ইণ্ডিয়া এডিশন, ৬নং খণ্ড)

মোটকথা, ইসলামী শরীয়ত ও অন্যান্য আসমানী ধর্মমতে নবী-রাসূলের শানে বেয়াদবী ও কটূক্তিকারীর কোন নিরাপত্তা নেই; তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া রাষ্ট্রের যেমন দায়িত্ব, তেমনি কোন মুসলমান যদি তাকে হত্যা করে তাহলে ইসলামী বিধানমতে তার জন্য কোন জবাবদিহিতা নেই।

শেষকথা

প্রিয় পাঠক! আমরা মুখে স্বীকার করি– পরমপ্রিয় মাতা-পিতা, কলিজার টুকরো সন্তান, প্রিয়তমা স্ত্রী এবং জানমাল, ইজ্জত-আব্রুর চেয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত। কিন্তু আমাদের চলন-বলনে, আচরণ ও উচ্চারণে এককথায় যাপিত জীবনের সকল অঙ্গনে কি আমরা এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারছি? আমরা কি পারছি জীবন-পরিক্রমার প্রতিটি ধাপে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূলের চাওয়া-পাওয়াকে প্রাধান্য দিতে? আমরা কি পারছি রাসূলের ভালোবাসায়, তার মর্যাদা ও ইযযত রক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করতে? যেমনটি করেছিলেন সাহাবী হযরত সাদ ইবনে রবী' রাযি.–

উহুদের রক্তাক্ত প্রান্তর। জায়গায় জায়গায় লাশের স্তূপ। আহতদের কাতরধ্বনিতে বিষণ্ন চারদিক। নবীজী ইরশাদ করলেন, সাদ ইবনে রবী' কোথায়? তাকে পেলে আমার সালাম বলবে। এক সাহাবী জানালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আল্লাহর রাসূল বললেন, শহীদানের স্তূপে খুঁজে দেখো। স্তূপীকৃত লাশগুলো একে একে সরানো হলো। নীচ থেকে বেরিয়ে আসল সাদ ইবনে রবী'র ক্ষতবিক্ষত দেহ। তিনি তখনো বেঁচে আছেন। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছেন। মুখে পানি দিয়ে বলা হল, আল্লাহর রাসূল তোমাকে সালাম বলেছেন, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। শোনামাত্রই হযরত সাদের যন্ত্রণামলিন চেহারা ঝলমলিয়ে উঠলো। মনের শক্তিবলে উঠে বসতে চাইলেন কিন্তু দেহটি যমীনে পড়ে গেল। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, রাসূলুল্লাহকে আমার সালাম দিয়ে বলবে– সাদ মৃত্যুমুখে পতিত; তবে সে জান্নাতের খোশবু পাচ্ছে। আর আমার সম্প্রদায় আনসারদের সমবেত করে বলবে, তোমাদের সর্দার মৃত্যুকালে তোমাদের ওসিয়ত করেছেন– হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা বেঁচে থাকতে যেন আল্লাহর রাসূলের শরীরে সামান্য আঁচড়ও না লাগে। নবীজীকে সাদ ইবনে রবী'র পয়গাম জানানো হল। নবীজীর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। আবেগঘন কণ্ঠে আল্লাহর রাসূল বললেন, আয় আল্লাহ! আমি সাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছি, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, উহুদ যুদ্ধের কিছুদিন পর একবার দেখি– হযরত আবূ বকর রাযি. চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। তার বুকের উপর একটি শিশু খেলা করছে। তিনি বারবার শিশুটিকে চুমু খাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম, এতো আদর করছেন, কার সন্তান এটি? হযরত আবূ বকর রাযি. চিৎকার করে উঠলেন– তুমি জানো না! এটি সাদ ইবনে রবী'র ইয়াতীম সন্তান! সাদের সন্তান বলেই আমি তাকে চুমু খাচ্ছি, আদর করছি! সাদ মৃত্যুর সময় তার ইয়াতীম সন্তানের কথা উচ্চারণ করেনি, তার অসহায় স্ত্রীর কথা মুখে আনেনি; সে বলেছে– তোমরা বেঁচে থাকতে আল্লাহর রাসূলের যেন সামান্যও আঁচড় না লাগে!

প্রিয় পাঠক! এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের রাসূলপ্রেম। এর থেকে আমাদের কি কিছুই শেখার নেই? সুদূর বাংলাদেশ থেকে ফ্রান্সের গলাটা চেপে ধরার ক্ষমতা হয়তো আমাদের নেই কিন্তু পণ্য বর্জনের মাধ্যমে নবীর দুশমনের ভোগবিলাসে আঁচড় কাটার সক্ষমতা তো অবশ্যই আছে! বস্তুত আল্লাহ তা'আলা মানুষের সাধ্য অনুপাতে দায়ভার অর্পণ করেন এবং সেই ভিত্তিতে হিসাব গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত কিছু ফরাসী পণ্যের তালিকা

টোটাল সিলিন্ডার গ্যাস, টোটাল ইঞ্জিন অয়েল (মবিল), লাফার্জ সিমেন্ট, বিক রেজার, বিক গ্যাসলাইট, বিক কলম, গার্নিয়ার ফেসওয়াস, স্কিনকেয়ার ও কসমেটিকস, লরিয়াল পারফিউম ও কসমেটিকস, সানোফি কোম্পানীর ওষুধ, ডাইওর কোম্পানীর কসমেটিকস, ঘড়ি ও জুয়েলারী, ইন্ডিয়ায় প্রস্তুতকৃত ফ্রান্সের হারমোনি সাবান ইত্যাদি।

লেখক পরিচিতি: শিক্ষক, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
খতীব, মুহাম্মদিয়া জামে মসজিদ, রামপুরা, ঢাকা

*দারুল উলূম করাচীর মুখপত্র মাসিক আল-বালাগ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ধারাবাহিক আত্মজীবনী 'ইয়াদেঁ' প্রকাশ করছে। রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক রাবেতা ইয়াদেঁ-এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করছে। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সম্মতিক্রমে অনুবাদ করছেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) থেকে ২০১৬ ঈসায়ীতে শিক্ষা সমাপনকারী **মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমী***

ইয়াদেঁ - یادیں

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

(দশম পর্ব - دسویں قسط)

আঞ্জুমান ইসলাহে সিবয়ান-এর গোড়াপত্তন

'বাবুল ইসলাম' ছিল আমাদের বাসার নিকটবর্তী মসজিদ। এর আলোচনা পেছনে অতিবাহিত হয়েছে। মসজিদের কাছেই একটি ঘরে হযরত হাজী মুহাম্মদ আইয়ূব ছাহেব রহ. থাকতেন। তার সন্তান জনাব মুহাম্মদ কালীম ছাহেব ছিলেন আমার সমবয়সী। (আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতার সঙ্গে দীর্ঘজীবী করুন।) মসজিদে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাতে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। আলহামদুলিল্লাহ! সেই বন্ধুত্ব এখনও অটুট রয়েছে।

জনাব কালীম ছাহেবের সঙ্গে খেলাধুলা, গল্প-আড্ডার সুযোগ আমার তেমন হয়নি। একদিন তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, শিশু-কিশোরদের মধ্যে দীনী জযবা পয়দা করার জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। অতঃপর তারই আন্তরিক ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মসজিদে প্রতি সপ্তাহে কিশোরদের নিয়ে একটি বৈঠক শুরু হয়ে গেল। খুবসম্ভব কালীম ছাহেব তখন স্কুলে সপ্তম অথবা অষ্টম শ্রেণীতে পড়তেন। কিন্তু পারিবারিক দীনদারী ও তরবিয়তের ফলে বয়স হিসেবে তার দীনীজ্ঞান ছিল খুবই ঈর্ষণীয়! তার বাকপটুতা ছিল আমার চেয়ে চমৎকার। মনে আছে, প্রথম মজলিসে তিনি হযরত উমর রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি উপস্থিত কিশোরদের সামনে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছিলেন। এটা কিশোরদের অন্তর্জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। আগেই বলেছি, কথা বলার সময় আমার বেশিরভাগ কথা আটকে যেতো। এজন্য কালীম ছাহেবের মতো হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করা আমার পক্ষে মুশকিল ছিলো। কিন্তু যখন কিশোরদের এই সম্মেলন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে থাকলো, আমাকেও প্রতিমাসে ওখানে কিছু না কিছু বলতে হতো। যতটুকু মনে আছে, আমি হেকায়াতে সাহাবা থেকে কোন সাহাবীর ঘটনা মুখস্থ করে আসতাম। আমার ভাতিজা হাকীম মুশাররফ হুসাইন ছাহেব রহ. যদিও আমাদের থেকে কিছুটা দূরত্বে বন্দর রোডস্থ বাসায় থাকতেন, কিন্তু কিশোরদের সেই সম্মেলনে তিনি নিয়মিত আগ্রহভরে অংশগ্রহণ করতেন। একবার আমরা চিন্তা করলাম, কিশোরদের এই সংগঠনের একটা নাম নির্ধারণ করা দরকার। তখনকার বুঝ-বুদ্ধি অনুপাতে আমরা এই সংগঠনের নাম নির্ধারণ করেছিলাম 'শো'বায়ে তাবলীগে ইসলাম'। এদিকে একটা খাতায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো। ঘটনাচক্রে সেই খাতাটি হযরত আব্বাজান রহ.-এর নজরে পড়ল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? আমি আব্বাজানের খেদমতে বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করলাম। আব্বাজান রহ. বললেন, এই নামটি উপযুক্ত মনে হচ্ছে না; তোমাদের সংগঠনের নাম 'আঞ্জুমান ইসলাহে সিবয়ান' রাখো। সুতরাং আমরা এই নামে লোগো, সিল ইত্যাদি তৈরি করে সংগঠনের কাজ আরও বেগবান করলাম। এই সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম আমাদের ব্রাঞ্চ রোডের বাসা পরিবর্তন করার পর পরিসমাপ্তি ঘটলো।

আমার আরবী শেখার প্রতিষ্ঠানসমূহ

এ বছরই পাকিস্তানে নিযুক্ত সিরিয়ার হাইকমিশনার জাওয়াদ আল-মারাবিত ছাহেব আব্বাজানের খেদমতে হাজির হলেন। তিনি যদিও লেবাস-পোশাকে পশ্চিমা-ধাঁচের ছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত ইবাদতগোযার এবং মহৎ হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। আব্বাজান রহ.-এর অত্যন্ত আস্থাভাজন ও ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। নিয়মিত তিনি আব্বাজানের খেদমতে যাতায়াত করতেন। তিনি নিজ উদ্যোগে আব্বাজান রহ.-এর সঙ্গে পরামর্শক্রমে সিরিয়ান হাইকমিশন এবং দারুল উলূমের মধ্যে একটি যৌথ চুক্তিনামা তৈরি করলেন। কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নয়, শিক্ষার্থীদেরকে সরাসরি আরবী শেখানো এবং আরবী ভাষার জাগরণ সৃষ্টি করা ছিল এই চুক্তিনামার মূল উদ্দেশ্য। হযরত আব্বাজান রহ. তার এই পরামর্শটি পছন্দ করে তা সাদরে গ্রহণ করে নিলেন এবং এর জন্য দারুল উলূমকে মূল মারকায হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে করাচীর আরো কয়েকটি জায়গায় মারকায গঠন করলেন। উস্তাদ মুহাম্মদ আমীন আল-মিসরী ওই সময় সিরিয়ান হাইকমিশনে الملحق الثقافي (কালচারাল এটাশে) পদে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে আরবী ভাষা শেখানোর জন্য এই সকল মারকাযের নেগরানী এবং সিলেবাস প্রণয়ন ও প্রস্তুত করার যাবতীয় যিম্মাদারী স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং নিজেও আরবী পড়ানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। দারুল উলূমে তার আরবী ভাষাশিক্ষার দরস পুরোদমে চালু হয়ে গেলো। তিনি প্রতিদিনের পাঠ লিখে আনতেন এবং সম্পূর্ণ দরস আরবী ভাষায় প্রদান করতেন। তার পড়ানোর কলাকৌশল ছিল অত্যন্ত চমৎকার। যে শব্দটি তিনি শেখাতেন বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে তার ব্যবহারও শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে দিতেন। এরপর এক-এক করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সেই ব্যবহার অনুশীলন করাতেন। বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও আরবীয় বাচনভঙ্গির প্রতিও তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি সর্বপ্রথম আমাদেরকে 'কিতাব' শব্দটি পড়িয়েছেন। তার জানা ছিল না যে, কিতাব শব্দটিকে উর্দূভাষায়ও কিতাব-ই বলা হয় এবং শিক্ষার্থীরা এর অর্থ-মর্ম সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল। মনে আছে, তিনি একটি কিতাব হাতে নিয়ে কিতাব শব্দটি নিদেনপক্ষে পঞ্চাশবার বলেছেন এবং অন্তত পঞ্চাশবার শিক্ষার্থীদেরকে দিয়েও বলিয়েছেন, যেন শিক্ষার্থীরা শুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। এভাবে তিনি প্রত্যেকটি দরস লিখে আনতেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে পুরোপুরি আয়ত্ত করিয়ে ক্ষান্ত হতেন। পরবর্তী সময়ে তার এই দরসগুলো কিতাব আকারে প্রকাশ পেয়েছিল, যার নাম ছিল–

طريقة جديدة لتعليم العربية

শুরুতে কিছুদিন আমরা উস্তাদ আমীন মিসরী রহ.-এর প্রস্তুতিমূলক দরসে শরীক হতাম। তিনি দরসে আসার আগে

প্রতিদিনের পাঠ প্রস্তুত করে নিয়ে আসতেন। কখনো কোন পাঠের প্রদর্শনীর জন্য ছাত্রদেরকে ডেকে নিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করাতেন। এই কাজের জন্য বেশিরভাগই আমার নাম উঠে আসত। দরসে সবচেয়ে কমবয়সী হওয়াই সম্ভবত এর কারণ ছিলো। আর এজন্য طريقة جديدة কিতাবেও আমার নাম এসেছে।

কিছুদিন পর উস্তাদ আমীন মিসরী রহ. অনুমান করলেন, জামাআতে বিভিন্ন ধরনের ছাত্র আছে; তাদের সবাই طريقة جديدة কিতাবটি পড়ার উপযুক্ত নয়। সে জন্য তিনি পরবর্তীকালে ছাত্রদের যোগ্যতা অনুসারে তিনটি জামাআত বানিয়েছেন। আমাকে তিনি দ্বিতীয় জামাআতে রেখেছেন। জামাআত সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আরো তিনজন উস্তাদ থেকে খেদমত নিতে হয়েছে। উস্তাদ আহমাদ আল-আহমাদ, উস্তাদ আব্দুল হামীদ হাশেমী এবং উস্তাদ ইয়াসীন আল-হালাবী। উস্তাদ ইয়াসীন আল-হালাবী থেকে শেখার এবং উপকৃত হওয়ার সুযোগ আমাদের হয়নি। কারণ তিনি আমাদের উপরের জামাআতে পড়াতেন। কিন্তু উস্তাদ আহমাদ আল-আহমাদ এবং উস্তাদ আব্দুল হামীদ হাশেমীর দরস থেকে আমি অনেক অনেক উপকৃত হয়েছি।

উস্তাদ আহমাদ আল-আহমাদ ছিলেন বড় চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ মানুষ। একবার দারুল উলূম করাচীতে এক আরব মেহমানের আগমন ঘটলো। তিনি আমাকে আরবীতে বক্তব্য দিতে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং বক্তব্যটি আমাকেই লিখে আনার নির্দেশ দিলেন। আমি আমার কাঁচাহাতে শুদ্ধ-ভুল মিলিয়ে কয়েক লাইন লিখে তাকে দেখালাম। শুরুতেই আমি নিজের জ্ঞান-স্বল্পতা এবং পুঁজির দৈন্য উল্লেখ করলাম। এটা দেখে তিনি বললেন, জ্ঞান-স্বল্পতার কথাটি কেটে দাও। এটা একজন বক্তাকে অনুভূতিশূন্য করে দেয় এবং তার বক্তব্যকে আবেদনহীন করে তোলে। এরপর তিনি নিজেই একটি বক্তব্য লিখে দিয়ে আমাকে বললেন, এটি মুখস্থ করে নাও। আমি মুখস্থ করে নিলাম। তিনি আমাকে বললেন, এবার আমার সামনে বক্তৃতা করে শোনাও এবং ওখানে যেভাবে উপস্থাপন করতে চাও করে দেখাও। আমি আমার দেশীয় রীতিতে বক্তব্য পাঠ করে শোনাতে লাগলাম। তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বক্তব্য এভাবে দেয় না! এসো, আমার সঙ্গে দাঁড়াও। অতঃপর তিনি স্বীয় ডান পা সামনে এবং বাম পা পেছনে রেখে বললেন, এভাবে দাঁড়াও; এভাবে দাঁড়ালে নিজের মধ্যে কনফিডেন্স বা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। এরপর তিনি এক-একটি বাক্য করে আমাকে হাতেকলমে শেখালেন এবং বললেন, এভাবে নয় এভাবে পাঠ করো। অতঃপর কিছু বাক্য ঈষৎ ঝাঁঝালো বা উঁচু আওয়াজে বললেন। যতক্ষণ না আমার আওয়াজ ও উচ্চারণ কাঙ্ক্ষিত মানে উত্তীর্ণ হল, তিনি এক-একটি বাক্য অনুশীলন করিয়ে গেলেন। এভাবে তিনি পূর্ণ বক্তব্যটি আমাকে অনুশীলন করিয়েছেন। আমিও তার দিকনির্দেশনা মোতাবেক অনুষ্ঠানে বক্তব্য উপস্থাপন করলাম। বক্তব্য শেষে তিনি আমাকে অনেক বাহবা দিয়েছিলেন।

অপরদিকে উস্তাদ আব্দুল হামীদ হাশেমী অত্যন্ত সুদর্শন টগবগে তরুণ ছিলেন। অমায়িক মানুষ ছিলেন। সবসময় হাসিখুশি থাকতেন। তিনি কখনও পাঠ লিখে আনতেন না, বরং তিনি ছাত্রদেরকে রসিকতা ও আনন্দদানের মধ্য দিয়েই আরবী শিখিয়ে দিতেন। কখনো ব্ল্যাকবোর্ডে কুরআনের কোন আয়াত, হাদীসের অংশ অথবা কোন আরবী বাক্য লিখতেন। এরপর তিনি তার সাহিত্যের ঝাঁপি খুলে বসতেন। কখনো আরবী কবিতার ব্যাখ্যা করতেন। সব সময় তিনি আরবী উচ্চারণের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন।

তিনি কোনো শিক্ষার্থীকে নিজের পাশে দাঁড় করাতেন। অতঃপর ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত বাক্য সামনে রেখে তাকে প্রশ্ন করতেন। সাথেসাথে অনেক রসাত্মক গল্পও শোনাতেন। কখনো সেই শিক্ষার্থীর সঙ্গে হাসি-মজাকও করতেন।

একবার তিনি সম্ভবত ‘তানাফুরুল হুরুফ’ এর মতলব বুঝিয়ে বলছিলেন যে, কোন বাক্যে এক ধরনের অনেক হরফ একত্র করতে নেই; এতে উচ্চারণে কঠিনতা সৃষ্টি হয়। ব্যাপারটি বুঝাতে গিয়ে তিনি দুই জেলের কথোপকথনের উদাহরণ দিয়েছিলেন যে, কোনো অঞ্চলে লোকেরা ডিঙ্গি নৌকাকে "ككك" (কাকাক) বলে। শব্দটি তিনটি ‘কাফ’-এর সমষ্টি ছিল। একবার এক জেলে নৌকায় করে মাছ শিকারে বের হল। নদীতে গিয়ে দেখল, আরেকটি জেলেও তার মত নৌকা নিয়ে মাছ শিকারে বের হয়েছে। এবার প্রথম জেলে দ্বিতীয় জেলেকে লক্ষ্য করে এই পংক্তি আবৃত্তি করল–

يا راكبا فى كَكَكِك - وصائدا فى شريكِك
كَكَكَكَ كَكَكَكِي - وكَكَكِي كَكَكَكَك.

অর্থ: হে স্বীয় নৌকায় আরোহী! এবং নিজ জাল দিয়ে মাছশিকারী! তোমার নৌকা আমার নৌকার মতো, আর আমার নৌকা তোমার নৌকার মতো।

ষোলটি ‘কাফ’ সম্বলিত এই পংক্তিটি তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে ছাত্রদেরকে পড়তে বললেন। ছাত্ররা পংক্তিটি পড়তে গিয়ে বারবার আটকে যাচ্ছিল। অবস্থাদৃষ্টে দরসের সবাই তো হেসে গড়াগড়ি!

মোটকথা তার দরস অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও আনন্দঘন ছিল। আমরা তার দরসের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে থাকতাম। একদিন তিনি ডানহাত মুষ্টিবদ্ধ করে ছাত্রদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন, যে আমার মুষ্টি খুলতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করবো। আমাদের জামাআতে কয়েকজন শক্তিশালী ছাত্র ছিল। সবাই একের পর এক তার মুষ্টি খোলার চেষ্টা করলো; কিন্তু কেউই সফল হচ্ছিল না। অবশেষে আমাদের এক সহপাঠী মাওলানা আব্দুর রাযযাক মুরাদাবাদী রহ. উঠে দাঁড়ালেন। ইনি পরবর্তীকালে মদীনায় হিজরত করেছিলেন এবং সেখানেই তার ইন্তিকাল হয়েছে। আব্দুর রাযযাক মুরাদাবাদী ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষ। কারো কাছে হার মানতে চাইতেন না। তিনি অসীম বীরত্ব আর শক্তিমত্তা নিয়ে অগ্রসর হলেন। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য! উস্তাযের মুষ্টিবদ্ধ হাত খোলার জন্য ছাত্র সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চলছে। একসময় উস্তাদ-ছাত্র উভয়ের চেহারা টকটকে লাল বর্ণ ধারণ করল। উস্তাদের লালবর্ণ চেহারা তার সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। অবশেষে আব্দুর রাযযাক ছাহেবও ব্যর্থ হলেন; তিনিও খুলতে পারলেন না। এই পরিস্থিতিতে উস্তাদ বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমার জন্য আরেকটু সহজ করে দেই। এই বলে তিনি আঙ্গুলগুলোর মাঝে কিছুটা ফাঁক তৈরি করে মুষ্টি হালকা করে দিলেন এবং আব্দুর রাযযাক ছাহেবকে বললেন, আপনি যদি কোনভাবে আপনার একটি আঙুল আমার মুষ্টির ভেতরে প্রবেশ করাতে পারেন, হতে পারে এর সাহায্যে আপনি আমার মুষ্টি সহজে খুলে ফেলতে পারবেন। সুতরাং আব্দুর রাযযাক ছাহেব বিপুল উদ্যমে তার একটা আঙ্গুল উস্তাযের মুষ্টির ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। কিন্তু যেই-না আব্দুর রাযযাক ছাহেব নিজের আঙ্গুল উস্তাদজীর মুষ্টির ভেতর প্রবেশ করালেন অমনিই উস্তাদজী আরো শক্তভাবে তার হাত চেপে ধরলেন। এবার তো তার আঙ্গুল উস্তাদজীর হাতে ফেঁসে গেলো! এখন আব্দুর রাযযাক ছাহেব উস্তাদজীর মুষ্টি

খুলবেন কি, নিজের হাতটি ছাড়ানোর জন্যই অস্থির হয়ে উঠলেন! এবার তিনি উস্তাদজীর মুষ্টি ছাড়ানোর ফিকির বাদ দিয়ে নিজের জান বাঁচানোর জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন। এদিকে উস্তাদ-ছাত্রের এমন রসিকতায় আমাদের পুরো জামাআত হেসে খুন! অবশেষ মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক ছাহেব চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করলে উস্তাদজী তাকে রেহাই দিলেন। মোটকথা, এভাবে তিনি আনন্দ ও রসিকতার ছলে বিভিন্ন উপলক্ষ তৈরি করে আরবী প্রবাদ প্রবচন ও কথোপকথন শেখাতেন।

আল্লাহ তা'আলা উভয় উস্তাদজীকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন! তারা উভয়ে আমাদের জামাআতে আরবী ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির পেছনে অভাবনীয় মেহনত করেছেন। এরপর বহু আরবদেশে আমার আরবীতে কথোপকথন অথবা ভাষণ-বক্তৃতার সুযোগ হয়েছে। ওখানকার লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি মিসর বা সৌদি আরবে পড়াশোনা করেছেন? আমি যখন বলি, আরবী ভাষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষা দারুল উলূম করাচী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল; এর বাইরে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে আমি আরবী শিখিনি, তখন আরবের লোকেরা যারপরনাই বিস্মিত হয়!

তবে বাস্তবতা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আরবী লেখালেখি ও ভাষণ-বক্তৃতায় যতটুকু যোগ্যতা দিয়েছেন, আমাদের উস্তাযে মুহতারাম শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা সাহবান মাহমূদ ছাহেব রহ.-এর তালীম-তরবিয়তই ছিলো এর প্রথম কারণ। তিনি আমাদেরকে আরবীর নিয়ম-কানুনই শেখাননি, আরবীতে লেখালেখির প্রতিও উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর দ্বিতীয় কারণ, শামের এই দুই উস্তাযের মেহনত। তারা উভয়ই প্রতিদিন আরবী কোন ইবারতের উপর বিশদ আলোচনা করতেন এবং সেই ইবারত সামনে রেখে আরবী লেখালেখি, ভাষণ-বক্তৃতারও অনুশীলন করাতেন।

শুরুতে শামের উস্তাদদের দরস দারুল উলূম নানকওয়াড়া'র একটি হলরুমে হতো। পরবর্তীকালে সেটি সোল হসপিটালের সামনে একটি স্কুলে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আমরা আসরের পর সেখানে গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টার জন্য তাদের দরসে অংশগ্রহণ করতাম।

সে বছর আমার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল যেটি দারুল উলূমের স্মরণিকা সংখ্যা রমযান ১৩৭৩ - শা'বান ১৩৭৪, মোতাবেক মে ১৯৫৪ - এপ্রিল ১৯৫৫ ঈসায়ী'য়ে ছেপেছিলো তার বিবরণ এই–

কুদূরী-৪৭, কাফিয়া-৫০, নাফহাতুল আরব-৫৩, তাইসীরুল মানতেক-৪৫, আল-বালাগাতুল ওয়াযিহাহ-৫০, আন-নাহবুল ওয়াযীহ-৫০, মিরকাত-৪৫। গড় নাম্বার-৪৮। পুরো জামাআতে প্রথম স্থান। নাফহাতুল আরব কিতাবেও প্রথম স্থান।

(উল্লেখ্য, তখন দারুল উলূম করাচীতে প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণমান ছিল ৫০, যেমনটি হযরত শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা. ইতিপূর্বে তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। –অনুবাদক)

ঐতিহ্যবাহী জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার সিনিয়র মুদাররিস

মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান ছাহেব

কর্তৃক রচিত ও অনূদিত মূল্যবান গ্রন্থসমূহ

ক্র.	গ্রন্থসমূহ	পৃষ্ঠা	মূল্য	ক্র.	গ্রন্থসমূহ	পৃষ্ঠা	মূল্য
০১	বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা [৩০টি বক্তৃতার দুর্লভ সংকলন]	১৯২	১২০	১১	ইরশাদাতে আকাবির	১৯২	১৪০
০২	বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ [৩০টি প্রবন্ধের মূল্যবান সংকলন]	২৩২	২০০	১২	ইরশাদাতে হযরত গাঙ্গুহী রহ.	১৯২	১৫০
০৩	সহীহ হাদীসের আলোকে নামায [আল্লামা আব্দুল মালেক ছাহেব দা.বা. সম্পাদিত]	৮০	৬০	১৩	মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত (মাও. মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী রহ.-এর মালফূযাত)	যন্ত্রস্থ	
০৪	কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ	৬৪	৪৫	১৪	বিনয় : উচ্চমর্যাদা সম্মানবৃদ্ধির উপলক্ষ [মূল : শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.]	৫৬	৭০
০৫	এন.জি.ও আগ্রাসন : দেশে দেশে	২৪	১৫	১৫	তাওবা : গুনাহসমূহের প্রতিষেধক [মূল : শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.]	৬৪	৭০
০৬	শিয়া মতবাদের স্বরূপ ও ইসলামী (?) ইরানের বর্তমান অবস্থা	১১২	৯০	১৬	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি নূরের তৈরি?	১৬	১০
০৭	বাহসুত তাকসীমিস সাবয়ী [উলূমুল হাদীস বিষয়ক আরবী পুস্তিকা]	৫৬	৫০	১৭	মনীষীদের ছোটবেলা [মূল : মাওলানা আসলাম শেখপুরী শহীদ রহ.]	৮০	৮০
০৮	মালফূযাতে রায়পুরী রহ. (আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.)	৭২	৬০	১৮	তোমার লীলাই দেখতে পাই [কবিতামালা]	৪৮	২৫
০৯	ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম (ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ.)	৮০	৬০	১৯	আহকামে মুসাফির	১২০	১০০
১০	মাজালিসে সিদ্দীক (সিদ্দীক আহমাদ বান্দাভী রহ.-এর মালফূযাত)	১৬৮	১৩০	২০	বিষয়ভিত্তিক বয়ান [অপ্রকাশিত]		

প্রাপ্তিস্থান : হাকীমুল উম্মাত প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ [মোবা: ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫]

কুরিয়ারযোগে পেতে যোগাযোগ করুন : ০১৭১২-৮১৮৩৪৮, ০১৯৮০-৪৮৫০৫৯

তাবলীগী বয়ান

১৯৮৮ ঈসায়ীতে কাকরাইল মসজিদে ঢাকার সমস্ত হালকার পুরানা সাথীদের উদ্দেশে প্রদত্ত

মুফতী যাইনুল আবেদীন রহ.-এর জরুরী বয়ান (প্রথম অংশ)

বয়ানলেখক: প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম দা.বা.

পটভূমি: *তাবলীগ জামাআতের বিশিষ্ট মুরুব্বী মুফতী যাইনুল আবেদীন ছাহেব রহ. ছিলেন তাবলীগের তিনও হযরতজীর নিবিড় সোহবতপ্রাপ্ত। ১৯৮৮ ঈসায়ীতে টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত পুরানাদের দশদিনের জোড়ের পর ঢাকার সমস্ত হালকার পুরানা সাথীদেরকে কাকরাইলে জড়ো করা হয়েছিল। ১৫ অক্টোবর শনিবার বাদ মাগরিব (০৬:২৮-০৯:২২) এ সকল পুরানা সাথীর উদ্দেশে তিনি নিম্নলিখিত বয়ানটি পেশ করেন। কাকরাইলের বিশিষ্ট মুরুব্বী হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব রহ.-এর বিশেষ নির্দেশনা ও তাগিদে আমি এটি কলমবন্দ করি। এ সময় আমি মুফতী ছাহেব রহ.-এর বাম হাঁটুসংলগ্ন বসা ছিলাম। আর হাজী ছাহেব রহ. উপবিষ্ট ছিলেন আমার ডানপাশে একেবারে গা-ঘেঁষে। বয়ান চলাকালীন বিদ্যুৎ চলে গেলে হাজী ছাহেব রহ. আমার খাতার উপর দীর্ঘসময় নিজ হাতে টর্চলাইট ধরে বয়ান লেখার কাজে সহায়তা করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের কবরকে ঈমান ও আমলের নূরে আলোকিত রাখুন। তাবলীগ জামাআতের বর্তমান সংকটে দিকনির্দেশনামূলক এই বয়ান পড়ে সবাইকে নেক ও এক হওয়ার তাওফীক দিন। কুরআন-সুন্নাহ-এ বর্ণিত মেযাজ ও রুচি অনুযায়ী তিন হযরতজীর বাতানো তারতীবে ইখলাস ও কুরবানীর সাথে দাওয়াতের মেহনত করার তাওফীক দিন। আমাকে, আমার পরিবার-পরিজন, পাঠকবৃন্দ ও তামাম উম্মতকে উভয় জগতে সত্যিকার কামিয়াবী নসীব করুন। আ-মীন।*

মাসনূন খুতবা পাঠ করার পর আয়াতে কারীমা ও হাদীসে পাকের তিলাওয়াত শেষে হযরত মজমাকে সম্বোধন করে স্বভাবসুলভ বুলন্দ আওয়াজে বলেন– কাবিলে ইহতিরাম বুযুর্গো, ভাইয়ো আওর আযীযো!

আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মেহনতে এই তাসীর ও প্রভাব রেখেছেন যে, এর দ্বারা মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে। পৃথিবীর যে কোন এলাকায়, যে কোন গোত্রে এবং সমাজের যে কোন তবকা ও স্তরে কোন নবীর আগমন ঘটেছে সেখানেই পরিবর্তন এসেছে। কোন নবী ব্যবসায়ীদের নিকট, কোন নবী কৃষকদের নিকট, কোন নবী শাসকদের নিকট– এভাবে একেক নবী একেক তবকা বা কওমের নিকট এসেছেন। যেমন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের নিকট এসে মেহনত করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাদেরকে অধীনতা ও জুলুম-অত্যাচারের দুর্বিসহ জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্বাধীনতা ও ন্যায়-ইনসাফের উপভোগ্য জীবন প্রদান করেছেন।

নবীগণ এসে নিজ নিজ কওম ও স্বজাতির লোকদেরকে বলতেন, ঈমান ও নেক আমল-ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করো দুনিয়া-আখেরাত উভয় জীবনে সফল হবে। পক্ষান্তরে ঈমান ও নেক আমলের উপর না চললে উভয় জগতে ব্যর্থ হবে। অনুরূপভাবে শাসকদেরকে বলতেন, ঈমান ও নেক আমলের উপর উঠে আসো; শাসনক্ষমতাও থাকবে আখেরাতও বনবে। নয়তো উভয় জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে; হুকুমত বরবাদ হবে, আখেরাতও বরবাদ হবে।

আল্লাহ পাক ঈমান ও নেক আমলের শর্তে পুরুষ-মহিলা সকলের জন্য হায়াতে তাইয়েবা তথা সুখময় জীবন-এর ওয়াদা করেছেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ: 'যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় নেক আমল করে, সে পুরুষ হোক বা মহিলা, আমি অতি-অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাবো এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী অবশ্যই প্রতিদান প্রদান করবো।' (সূরা নাহল-৯৭)

আয়াতে কারীমায় দুই-দু'টি তাগীদ (লাম তাকীদ ও নূন তাকীদ)-এর মাধ্যমে জোর দিয়ে ঈমান ও নেক আমলের উপর সুনিশ্চিত কামিয়াবীর ওয়াদা করা হয়েছে। বস্তুত ঈমান ও নেক আমলের উপর আল্লাহ পাক বান্দাকে মাহবুবিয়্যাত, মারযিয়্যাত ও সুকূন দান করেন। মাহবুবিয়্যাত হল, অপরের ভালোবাসার পাত্র হওয়া। এটা মানুষের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু। আল্লাহ পাক যাকে মাহবুবিয়্যাত দান করেন, তাকে স্বয়ং নিজেও ভালবাসেন এবং তার অন্যান্য মাখলুকাত তথা ফেরেশতা, মানুষ, জিন, জীবজন্তু, পশু-পাখি, পাহাড়-পর্বত সকলেই ভালোবাসে। মারযিয়্যাত মানে সমস্ত মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও মর্জিকে কারও প্রতি রুজু করা। আর সুকূন হল দিলের শান্তি, যা হাসিল হলে কখনও পেরেশানী আসবে না। ঈমান ও নেক আমলের তাওফীক নসীব হলে পাক-সাফ ও পবিত্র জীবন লাভ হবে, আর যে পেশায় কর্মরত আছি, তা-ও ফলদায়ক হবে। আমাদেরকে পেশা তথা জীবিকা উপার্জনের জন্য দৌড়-ঝাঁপ ছাড়তে বলা হয়নি, শুধু নিয়ম-পদ্ধতি সহীহ করতে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, কিছু সময় ছাড়তেও বলা হয়, তবে সেটা আল্লাহর জন্য করা শেখার উদ্দেশ্যে। ভালো করে শুনে রাখুন, কেউ যদি আল্লাহর জন্য ব্যবসা ছাড়তে না পারে, কসম খেয়ে বলা যায়, সে আল্লাহর জন্যে তা করতেও পারে না। বলুন, ছাড়া সহজ না করা সহজ? অবশ্যই ছাড়া সহজ। অতএব, যে আল্লাহর জন্যে সহজটা ছাড়তে পারে না সে আল্লাহর জন্য করতেও পারবে না।

কেউ দাওয়াতের কাজে বের হওয়ার নিয়ত করলে তাকে বিবি-বাচ্চার হকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় হয়। বিবি-বাচ্চার প্রকৃত হক ও অধিকার কী? যে তার বিবিকে সেভাবে রাখে না, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহাতুল মুমিনীনদেরকে রেখেছেন, সে বিবিকে জাহান্নামে নিচ্ছে। যে তার মেয়েকে সেভাবে রাখে না, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাযি.-কে রেখেছেন, সে মেয়েকে জাহান্নামে নিচ্ছে। অনুরূপভাবে যে তার সন্তানকে সেভাবে লালন-পালন করে না, যেভাবে হযরত আলী রাযি. হাসান ও হুসাইন রাযি.-কে লালন-পালন করেছেন, সে-ও নিশ্চিতভাবে সন্তানকে জাহান্নামের লাকড়ি বানাচ্ছে। সন্তানেরা আমাদের প্রতি কী এমন জুলুম করল যে, আমরা তাদেরকে জাহান্নামের লাকড়ি বানাচ্ছি? বস্তুত প্রতিটি শিশু ইসলামী ফিতরত ও স্বভাব নিয়ে

জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা ও পরিবেশ তাকে বিনষ্ট করে। শিশুরা পরিবেশ দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি প্রভাবিত হয়। পরিবারে বাংলায় কথা বলা হলে শিশুও বাংলা বলে। ঘরের লোকজন নামাযী হলে শিশুও নামাযে লেগে যায়। অন্যেরা টি.ভি. দেখলে শিশুও টি.ভি. দেখে, গালাগালি করলে শিশুও গালি দেয়, মিথ্যা বললে শিশুও মিথ্যা বলে। স্মরণ রাখুন, ঘর-পরিবার আল্লাহর জন্যে ছাড়তে না পারলে সেটা সহীহও করা যাবে না। সহীহ করার জন্যেই মূলত ছাড়তে বলা হয়।

হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যে মেহনত করেছেন এবং যে মেহনতের দ্বারা জীবনে পরিবর্তন আসে, যিন্দেগী সহীহ হয় আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে আমাদেরকে সে মেহনতে লাগিয়েছেন। এর জন্য বেশি বেশি শোকর আদায় করা দরকার। তবে–

তিন শর্তে এ মেহনতের দ্বারা পরিবর্তন আসবে

(ক.) মেহনত যখন শুধু আল্লাহর জন্য করা হয়। প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি অর্জন কিংবা টাকা-পয়সা উপার্জন অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে মেহনত করলে কোন ফল পাওয়া যাবে না। মেহনত শুধু আল্লাহর রেযামন্দী ও সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে।

(দুই.) মেহনত যখন সহীহ তরীকায় করা হয়। এজন্য মেহনতের সহীহ তরীকা শিখতে হবে। আল্লাহ পাক তার কালামে মাজীদে বলেন–

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

অর্থ: 'মহিমাময় সেই সত্তা, যার হাতে গোটা রাজত্ব, তিনি সবকিছুর উপর পরিপূর্ণ শক্তিমান। তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে যাচাই করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল।' (সূরা মুলক-১-২)

বুঝা গেলো, আল্লাহ তা'আলা সুন্দর আমল চান। আমল সুন্দর হবে যখন তা সহীহ হবে। আমল সহীহ হবে যখন তা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় করা হবে। আল্লাহ পাক বেশি আমল চান না, সহীহ ও সুন্দর আমল চান। কথার কথা, নফল নামায ১০০ রাকা'আত দরকার নেই; ১০ রাকা'আতই হোক কিন্তু সহীহ ও সুন্দর হোক। নয়তো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল মিলবে না। হাদীসে এসেছে, একব্যক্তি নামায পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখছিলেন। নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামায পড়ো, তুমি তো নামায পড়োনি। সে আবার পড়ে আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাকে বললেন, নামায পড়ো, তুমি তো নামায পড়োনি। সে আবার পড়ে আসল। এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, নামায পড়ো, তুমি তো নামায পড়োনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে দিলেন, রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে না দাঁড়ালে এবং দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে না বসলে নামায হয় না। এই হাদীস শোনানোর উদ্দেশ্য হল, নামাযের যেমন সহীহ তরীকা আছে অনুরূপ তাবলীগেরও সহীহ তরীকা আছে। ভালো কাজও সহীহ তরীকায় না করলে ফলাফল পাওয়া যায় না।

(তিন.) মেহনতের পরিমাণ যখন পূর্ণ হয়। মেহনতের পরিমাণ পূর্ণ হলে তখন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কেউ জমি কিনল, পানির বন্দোবস্ত করল, এক-দুই বার চাষও দিল অতঃপর ধানের অপেক্ষা করতে থাকল। সবাই বলবে, মেহনত পূর্ণ হয়নি; বীজ ফেলা বাকি আছে। এখন কৃষক যদি বলে, সামান্য কাজই-না বাকি আছে, এটুকু ছাড়া ধান ফলবে না কেন? লোকে তার কথা মানবে? মানবে না। মোটকথা উল্লিখিত তিনটি বিষয় সামনে রেখে দাওয়াতের কাজ করতে হবে।

শুনেশুনে কোন জিনিস পূর্ণরূপে বোঝা যায় না। শোনার উদাহরণ হচ্ছে পানি। পানিকে কলস, লোটা, গ্লাস যার মধ্যেই ঢালা হবে তা ঐ পাত্রের আকার ধারণ করবে। তদ্রুপ দাওয়াতের মেহনতও শুনেশুনে শেখা যায় না। কাম করনেওয়ালার সঙ্গে থেকে শিখতে হয়। মনে পড়ছে, নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাজীবন থেকে ফারেগ হয়ে পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেছি। অনেক বড় বড় কিতাব পড়েছি। নামায সম্পর্কে অনেক হাদীস পড়েছি। অতঃপর একবুযুর্গের নামায পড়া দেখে অনুভব হল যে, এতোকিছু জানা সত্ত্বেও আমার নামায দুরস্ত হয়নি। ডাক্তার হতে হলে শুধু কিতাব পড়ে, লেকচার শুনে ডাক্তার হওয়া যায় না। কিতাব পড়ার পর একজন ডাক্তারের সঙ্গে থেকে ডাক্তারি শিখতে হয়। ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে থেকে শিখতে হয়। অনুরূপ দর্জি হতে হলে দর্জির সঙ্গে থেকে শিখতে হয়।

কাকে বলে মসজিদের কাজ?

তাবলীগী মেহনতের জায়গা কোনটি? মসজিদ। একজন বলল, মসজিদে কাজ হচ্ছে কিন্তু বাড়ছে না। বললাম, আচ্ছা, এই যে 'কাজ হচ্ছে' বলে দাবী করছো সেই কাজটা কী? বলল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোজানা তালীম, সপ্তাহে দুই গাশ্‌ত এবং মাসে তিনদিনের জামাআত। বললাম, এগুলো অবশ্যই মসজিদ ও মসজিদ-সংশ্লিষ্ট কাজ; তবে আমরা দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীদেরকে 'মসজিদের কাজ' বলে যে কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেই, তার দ্বারা এসব কাজ উদ্দেশ্য নয়। বরং মসজিদের কাজ হচ্ছে–

এক: মসজিদ-মহল্লার সবাই ঈমানওয়ালা হোক। ঈমানওয়ালা বলতে শুধু কালেমা পড়ে নিল এটা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য ঐ ঈমান হাসিল করা, যার সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বলেছেন–

عن عبد الله بن عمر قال ... تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرأن فازددنا ايمانا.

অর্থ: 'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ঈমান শিখেছি, তারপর কুরআন শিখেছি। এর ফলে আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।' (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৬১, আল মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী; হা.নং ১৩৭৮, আস সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী; হা.নং ৫৪৯৮)

অর্থাৎ আমরা আগে ঈমান শিখেছি তারপর কুরআন শিখেছি। নয় থেকে তেরো বছর দাওয়াতের মেহনত করে মক্কা শরীফে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যে ঈমান শিখেছিলেন সেই ঈমান কী? সেই ঈমান হল, অন্তরে একথা পয়দা করা যে, মাখলুক থেকে কিছু হয় না, আল্লাহ থেকে সবকিছু হয়। হজরতজী ইউসুফ ছাহেব রহ. বলেন, যতক্ষণ না তামাম মাখলুককে মৃত সাপ মনে করা হয় ততক্ষণ ঈমান কামেল ও পূর্ণাঙ্গ হয় না। মসজিদের মহল্লার শতকরা একশজন পুরুষ-মহিলা এই ঈমান শিখুক। এটা মসজিদের এক নম্বর কাজ।

দুই. মসজিদ-মহল্লার সবাই ইখলাসওয়ালা হোক। যে কোন নেক আমল সবাই আল্লাহ তা'আলাকে রাজি-খুশি করার জযবায় করুক। নয়তো কোন আমল কবুল হবে না।

তিন. মহল্লার শতভাগ পুরুষ-মহিলা জরুরী ইলম শিখুক।

চার. মহল্লার শতভাগ পুরুষ-মহিলা আখলাকওয়ালা হোক। এর দ্বারা তাদের মধ্যে বিনয়-নম্রতা, আমানতদারী, সত্যকথন, পরিচ্ছন্ন লেনদেন, পরস্পরের হক আদায়– সব আসবে।

আমি মসজিদের কাজের কথা বলছি। কাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র সামনে থাকলে

মেহনত ও কুরবানী করা সহজ হয়। কাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা না থাকলে কাজে জান-মাল লাগানো যায় না। কেননা মেহনতের পরিমাণ অনুযায়ী মানুষ প্রস্তুতি নেয়। উদাহরণস্বরূপ শাক কিনতে পাঁচ টাকা লাগে, হজ্জ করতে (হযরতের বয়ানের যামানায়) ষাট হাজার টাকা লাগে। তো শাক কিনতে যাওয়ার সময় বলে– এই তো আসছি। কিন্তু হজ্জ করতে যাওয়ার সময় 'এই তো আসছি' বলে না; বলে– এক-দুই মাস পর আসছি। বুঝা গেল, কাজের পরিমাণ অনুযায়ী মানুষ জান-মাল খরচ করার প্রস্তুতি নেয়।

এই যে মসজিদের কাজের বিবরণ দেয়া হল– কয়েকজন মিলে তালীম করে নিলে, সপ্তাহে একবার বয়ান করে নিলে এবং মাসে একবার তিনদিন লাগালেই তা আদায় হয়ে যাবে? না, এর দ্বারা মসজিদের কাজ পুরোপুরি আদায় হবে না। মসজিদের কাজ আদায় করতে হলে সকাল, দুপুর, বিকাল, রাতে নিয়মিত কাজ করতে হবে। কারণ কিছু লোক সকালে, কিছু লোক দুপুরে আর কিছু লোক বিকালে অবসর হয়। অতএব মেহনত সারাদিন করতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে, একজন লোকের পক্ষে চারবেলা মেহনত করা কীভাবে সম্ভব? না, একই ব্যক্তিকে চারবেলা মেহনত করতে হবে এটা জরুরী নয়। বরং যাদের সকালে সুযোগ থাকে তারা সকালে মেহনত করবে। যারা দুপুরে সুযোগ পায় তারা দুপুরে করবে। অনুরূপভাবে যারা বিকালে সুযোগ পায় তারা বিকালে কিংবা মাগরিবে নয়তো ইশায় মেহনত করবে। মোটকথা, প্রত্যেকে নিজ নিজ সময়-সুযোগ অনুযায়ী মেহনত করবে। এভাবে পালাক্রমে মেহনত করা খুবই সহজ।

এক মসজিদের কারগুযারী নিলাম। সেখানে তিনটি জামাআত আছে। এক জামাআত সকালে, এক জামাআত দুপুরে আর এক জামাআত ইশা পর্যন্ত মেহনত করে। এক বয়োবৃদ্ধ পুরানা সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম, ইশার পর আপনার কী কাজ? বললেন, কাজ নেই। বললাম, ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে পড়ে থাকুন; বিনা মেহনতে সাওয়াব পাবেন। ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে পড়ে থাকলে আল্লাহ পাক পেছনের গুনাহ মাফ করে দেন। ব্যস, এই এক-দুই কথায় চারজন বৃদ্ধ মসজিদে রোযানা ইতিকাফের নিয়তে শবগুযারী করতে তৈরি হয়ে গেলেন। মাশাআল্লাহ, এভাবে ঐ মসজিদে রাতের মেহনতও যিন্দা হল।

মসজিদে পালাক্রমে ২৪ ঘণ্টা মেহনত জারি রাখতে হবে। সর্বদা ঈমানের আলোচনার মজলিস, ফাযায়েলের তালীমের মজলিস কায়েম রাখতে হবে। তাহলে আমলের শওক পয়দা হবে।

একবার এক মসজিদে জামাআত আসল। জিজ্ঞেস করলাম, কী নিয়তে এসেছেন? প্রশ্ন শুনে একে অপরের দিকে তাকায়। বললাম, ভাই! নিয়ত তো ভেতরের জিনিস, আরেকজনের চেহারার দিকে তাকাচ্ছেন কেন? একজন সাহস করে বলল, তাবলীগ করতে এসেছি। বললাম, এতো ব্যাপক করে না, সহজে বলুন। তখন সবাই বলল, আমাদের নিয়তই নাই; মারকায থেকে পাঠানো হয়েছে তাই এসেছি। বললাম, যাক, সত্য কথা বলেছেন। তবে শুনে রাখুন, হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যখন কোন জনপদে প্রবেশ করতেন, সেই জনপদের শতভাগ লোক মুসলমান হয়ে যাক এ নিয়তে প্রবেশ করতেন। একজন মুসলমান কোন জনপদে প্রবেশের সময় সেখানকার শতকরা শতভাগ অধিবাসী পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হয়ে যায় এ নিয়তে প্রবেশ করা দরকার।

এক সাথী তালীমের সময় আমার কাছে আসল। বললাম, এটা তো তোমার তালীমের সময়, এখন তুমি এখানে কেন? বলল, তালীম চালিয়ে নেয়া হবে। বললাম, কীভাবে চালিয়ে নেয়া হবে? বলল, কোনোমতে চালিয়ে নেয়া হবে। বললাম, দেখো, দোকানে নিজে বসি, সংসার নিজে দেখাশোনা করি আর দীনের মেহনত কোনোমতে চলার জন্য অন্যের যিম্মায় ছেড়ে দিয়ে আসলাম!

এখানে ঢাকা শহরের ৩৩টি হালকাই উপস্থিত হয়েছে। প্রতিটি হালকায় এই ফিকির হওয়া দরকার যে, তিনচিল্লা দেয়া সাথীদের সংখ্যা অনুপাতে যেন জামাআত বের হয়। জামাআত তৈরি করার নিয়ম হল– তিনদিনে বের হওয়ার জন্য তিনচিল্লা দেয়া কমপক্ষে দশজন সাথী তৈরি করবেন। এই দশজনের সঙ্গে এক-দু'জন চিল্লার সাথী নিবেন। এরপর নতুন সাথী যে কয়জন হয় তাদেরকেও জুড়ে নিবেন। এভাবে ১১/১২জনকে বুনিয়াদ বানিয়ে তিনচিল্লা লাগানো সাথীদের সংখ্যা অনুপাতে জামাআত তৈরি করবেন। এতে করে কোনো মসজিদে তিন চিল্লাওয়ালা ৩০জন সাথী থাকলে সে মসজিদ থেকে প্রতি মাসে ৩টি জামাআত বের হবে। ৫০জন থাকলে ৫টি জামাআত বের হবে। ৭০জন থাকলে ৭টি জামাআত বের হবে।

একজন গাশ্তে যাচ্ছিল। তাকে নিয়ত জিজ্ঞেস করলাম। বলল, 'সারা আলমের উম্মতের মাঝে দীন ছড়িয়ে যাক, এ নিয়তে যাচ্ছি।' জ্বী, এমন নিয়তই করা দরকার! বলুন তো, যে ব্যক্তি হজ্জের নিয়তে বের হয় তার প্রথম কদম কোথায় পড়ে? ঘরে বা স্টেশনে। এই ব্যক্তি যদি মঞ্জিলে পৌঁছার আগে পথিমধ্যেই মারা যায়, হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সে মাকবুল হজ্জের নেকী পাবে। এটা নিয়তের বরকত।

আগে ফায়সালাবাদ থেকে একদিনের জামাআতই বের হওয়া মুশকিল ছিল। এখন সেখানে তিনচিল্লার মসজিদওয়ার জামাআত বের হয়। একবার খুব চিন্তিত ছিলাম। সাথীরা জিজ্ঞেস করল, কি নিয়ে চিন্তা করেন? বললাম, দেশবিভাগের আগে কোলকাতায় দুইদিন মেহনত করে একদিনের একটি জামাআত বের হয়েছিল, খুব খুশি হয়েছিলাম। আর এখন বিদেশের জন্য জামাআত বের হলে খুশি হই। তো মিলিয়ে দেখছিলাম যে, কোন খুশিটি বেশি উপভোগ্য। ভেবে দেখলাম, ঐ যে কোলকাতায় দুই দিন মেহনতের পর একদিনের জামাআত বের হওয়ায় খুশি হয়েছিলাম সেটাই বেশি উপভোগ্য। কারণ, সে সময় জামাআত বের হওয়ার পরিবেশ ছিল না।

নিজের মধ্যে তাকাযা পয়দা করা দরকার। দীনের জন্য, আল্লাহর জন্য তাকাযা পয়দা করলে আল্লাহ অবশ্যই পুরা করবেন। তাকাযা পয়দা করা আমার কাজ, আর তাকাযা পুরা করার মালিক আমার আল্লাহ। একবার বেলালপার্ক মসজিদে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, কী করছিলে? বলল, তাকাযা রাখছিলাম। বললাম, তাকাযা কাকে বলে জানো? আমাদের পাকিস্তানে 'কোথায় যাচ্ছো?' বলে প্রশ্ন করলে অনেক সময় উত্তর দেয়া হয় 'তাকাযায়'। এক্ষেত্রে তারা তাকাযা বলে পেশাব-পায়খানা ইত্যাদির জরুরত বুঝিয়ে থাকে! আমি আপনাদেরকে 'তাকাযা' বলে পেশাব-পায়খানার জরুরত বুঝাচ্ছি না। তবে এই তাকাযার সঙ্গে আসল তাকাযার মিল আছে। সেটা হল, তাকাযা বলা হয় অন্তরের এমন আবেগ ও উদ্দীপনাকে যা পূরণ না করলে স্বস্তি হয় না, ভালো লাগে না। অনুরূপভাবে কারো মধ্যে যখন দীনের তাকাযা পয়দা হয়, সেটা পূরণ না করলে তার ভালো লাগে না, স্বস্তি পায় না।

একবার একসাথী শবগুযারীতে আসল না। জিজ্ঞেস করলাম, কেন আসোনি? বলল, জরুরত ছিল তাই আসতে

পারিনি। বললাম, জরুরত কাকে বলে জানো? বলল, না-তো, আপনি বলে দিন। বললাম, জরুরত ঐ জিনিস যা না করলে লোকসান হয়। এবার বলো, তুমি যে কাজে লিপ্ত থাকায় শবগুযারীতে আসতে পারোনি, সেটা ছেড়ে দিয়ে শবগুযারীতে আসলে সত্যিই কি তোমার লোকসান হয়ে যেতো? বলল, জরুরতের এই মর্ম আমার জানা ছিল না। বললাম, তাহলে নিয়ত ছোট করো কেন?

একলোক অফিসে যাচ্ছে। এমন সময় তার শ্যালক এসে হাজির। সে তার সঙ্গে কোলাকুলি করল। পাকিস্তানে প্রবাদ আছে– 'সারা দুনিয়া একদিকে আর বিবির ভাই (শ্যালক) একদিকে।' অর্থাৎ, যতো সম্যসাই থাকুক শ্যালককে আদর-কদর না করলে চলবে না। কিন্তু ঐ লোক শ্যালককে রেখেই অফিসে চলে গেল। দেখা যাচ্ছে, শ্যালকের মতো জিনিসও অফিসের তুলনায় তার কাছে তুচ্ছ। কিন্তু গাশ্তের ব্যাপার হলে আমরা অনেক সময় বলি, বাসায় মেহমান ছিল, এজন্য গাশ্তে জুড়তে পারিনি। বলার উদ্দেশ্য হল, যে কারণে গাশ্ত কামাই করি, অফিস কিন্তু সে কারণে কামাই করি না! আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে, আমরা আসলে কোন জিনিসকে কোন জিনিসের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি!

এক মসজিদে মাকামী গাশ্ত হচ্ছিল। গিয়ে দেখি, একসাথী চাদর মুড়ি দিয়ে শোয়া। জিজ্ঞেস করে জানলাম জ্বরে আক্রান্ত। জ্বরও হালকা-পাতলা না, একেবারে ১০৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বললাম, কখন থেকে জ্বর? বলল, গতকাল থেকে। বললাম, এই জ্বর নিয়ে না আসলেও তো পারতে! বলল, আমি তো শুয়ে থাকতে পারি; ঘরেও শুয়ে থাকতাম, এখানেও শুয়ে আছি। মাকামী গাশ্তের দিন গরহাজির থাকবো কেন? জ্বী, একেই বলে মেহনত, একেই বলে কাজের সঙ্গে মহব্বত!

এভাবে হরহালতে সর্বাবস্থায় মেহনতে লেগে থাকতে হবে। বিবাহ-শাদী, রোগ-ব্যাধি, আত্মীয়-মেহমান ইত্যাদির জন্যে কাজ ছুটবে কেন? আসলে অন্তরে কাজের আহাম্মিয়্যাত ও গুরুত্ব নেই তাই ছুটে যায়। অথচ এমন হওয়া উচিৎ যে, সব কোরবান করতে পারি, দীনের কাজ কোরবান করতে পারি না। দীনের মেহনতের প্রতি এমন মনোভাব ও তৎপরতা থাকলে আল্লাহ তা'আলা অন্য সবাইকে আমার উপর কোরবান করবেন, আমাকে কারো উপর কোরবান করবেন না।

এক শাহ সাহেবের ঘটনা। কেউ তাকে বলল, জনাব! বলুন না, আমাকে কতোটা ভালবাসেন? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করো এবং লক্ষ্য করো সেখানে আমার প্রতি কতটুকু আকর্ষণ বিদ্যমান। আমার প্রতি তোমার অন্তরে যতটুকু সঞ্চিত আছে আমার অন্তরেও তোমার জন্য ততটুকু সঞ্চিত আছে। অনুরূপভাবে কেউ যদি দেখতে চায় যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার হাইসিয়্যাত ও পদমর্যাদা কী? তাহলে দেখতে হবে, আমার কাছে আল্লাহর দীনের হাইসিয়্যাত ও মর্যাদা কতটুকু! অর্থাৎ আমি কতটুকু আল্লাহর দীনের জন্য কুরবানী পেশ করার হিম্মত রাখি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার দীনের জন্য কুরবানী পেশ করার হিম্মত দান করুন। আ-মীন।

[বি.দ্র. আয়াত-হাদীসসমূহের ইবারাত-হাওয়ালাহ অক্ষরবিন্যাসকারী কর্তৃক সংযোজিত ও অনূদিত। অক্ষরবিন্যাস-কারী: জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় ২০০২, ২০১২ ও ২০১৪ ঈসায়ীতে যথাক্রমে হিফয, দাওরা ও ইফতা সমাপনকারী মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম (বয়ান লেখকের মেজো সাহেবযাদা)]

মারকাযুল কুরআন ঢাকা مركز القرآن ڈھاکہ
শতভাগ মানুষের কাছে কুরআনের আলো পৌঁছানোর লক্ষ্যে
বাড়ি নং-৩৪, রোড নং-১ (বাঁশের পুলের পশ্চিমপার্শ্ব সংলগ্ন), স্বপ্নধারা হাউজিং, বসিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

বিভাগসমূহ
আবাসিক / অনাবাসিক

আদর্শ নাযেরা বিভাগ
মানসম্পন্ন হিফজুল কুরআন বিভাগ
সুশৃঙ্খল নৈশ বিভাগ
মানসম্মত একাডেমী বিভাগ

ভর্তি চলছে

মাদরাসার বৈশিষ্ট্য
- পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, একান্ত নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশে শিক্ষাদান
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলীর মাধ্যমে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পাঠদান
- কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা
- এতীম, অসহায়, অসচ্ছল, মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুবিধা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী দা. বা.
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা
ইমাম ও খতীব, বাইতুস সুবূহ জামে মসজিদ, নূরজাহান রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

পরিচালক হাফেয মাওলানা মুফতী আবদুল লতীফ দা. বা. মোবাইল: ০১৯২৪-৭৩৮৪৪১

তাবলীগী পয়গাম

আলমী শূরার অধীনে অনুষ্ঠিত রায়বেন্ড ইজতিমা ২০২০-এর পয়গাম

বিসমিহী সুবহানাহু ওয়া তা'আলা

রায়বেন্ড
১০ নভেম্বর ২০২০ ঈসায়ী
২৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী

মুহাতারামীন ও মুকাররামীন আহবাবে কেরাম!

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনাদের সকলকে তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কাজ করার তাওফীক দিন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের সমুচ্চ সত্তার প্রতি আশাবাদী যে, তামাম আহবাব ও বন্ধুবর্গ সুস্থ ও নিরাপদে থেকে দিন-রাত দীনের উঁচা মেহনত শেখা এবং সারা দুনিয়ায় তার প্রসার ঘটানোর মেহনতে ব্যস্ত আছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের মেহনত কবূল করে সারা আলমের হেদায়াতের উসীলা বানান। আ-মীন।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা এ বছর রায়বেন্ড ইজতিমায় (৬,৭,৮ নভেম্বর) নিজ কুদরতের ঝলক দেখিয়েছেন যে, আল্লাহর শোকর, বাহ্যিক সকল নিয়ম-কানূন মেনে স্রেফ আল্লাহর ফযল ও করমে এক বহুত বড় মজমা বড় কুরবানীর সাথে একত্র হয়েছেন। তিনদিন পর্যন্ত তারা এমন একাগ্রতার সঙ্গে আমলে নিমগ্ন ছিলেন যে, বর্তমান যামানায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া মুশকিল মনে হয়।

পুরো মজমা এক সাল, সাত মাসের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফরের এরাদা করেছেন এবং এই উঁচা মেহনতকে নিজের জীবনের মাকসাদ বানানোর মজবুত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। নিঃসন্দেহে এতে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাথীদের চিন্তা-ফিকির ও দু'আর ভরপুর অংশ জড়িত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এই উঁচা মেহনতে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কবুলিয়তওয়ালী ছিফাতের সঙ্গে লেগে থাকার তাওফীক দান করুন। আ-মীন।

মেরে আযীযো! আল্লাহ রব্বুল ইয্যতই সমস্ত মাখলুকের খালিক ও মালিক। তিনি গোটা বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করেন। লাঠির মতো উপকারী বস্তুকে সাপের মতো অপকারী বস্তু বানিয়ে দেখিয়ে দেন যে, লাঠির উপকার তার নিজস্ব নয়, সাপের অপকারও তার নিজস্ব নয়। লাঠি হোক বা সাপ– এদের উপকার-অপকার তো পরের কথা– এগুলোর আকৃতিও আল্লাহর হুকুমের তাবেদার ও অনুগামী।

আর আল্লাহ তা'আলার হুকুমও কোন আকৃতির মুখাপেক্ষী নয়। তাঁর হুকুম তো ফেরআউন ও তার লোক-লস্করকে পানির মধ্যে ডুবিয়ে দেয় আবার হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের পেটে সমুদ্রের তলদেশে বাঁচিয়ে রাখে; হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তার কওমকে পানির ভেতর দিয়ে অতিক্রম করিয়ে দেয় আবার কারূনকে পানি ছাড়াই যমীনে ডুবিয়ে দেয়।

সেই সুমহান ও শক্তিমান সত্তার কী অপার অনুগ্রহ যে, তিনি দীন ও নিজ হুকুম-আহকাম পালনের আকৃতিতে এই কমযোর ও অসহায় মানুষকে নিজের সঙ্গে আপন হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

মানুষ যদি আল্লাহকে রব্ব মেনে নেয়, তারই দিকে রুজু করে এবং তারই হুকুমের প্রতি খেয়াল রেখে যিন্দেগী যাপন করে তাহলে আল্লাহ রব্বুল ইয্যত নিজের পূর্ণ কুদরত ও শক্তিমত্তা নিয়ে তার সঙ্গ দেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের ক্ষুদ্র একটি দল যখন বদরের ময়দানে হাতিয়ার ছাড়াই এক হাজারের অস্ত্রধারী বাহিনীর মোকাবেলায় নেমে পড়লেন তখন তো মৃত্যুর সকল আসবাব-উপকরণ বিদ্যমান ছিল; বাঁচার কোন রাস্তাই ছিল না! ব্যস, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ প্রতিপালকের উদ্দেশে ফরিয়াদ ও কান্নাকাটিতে লেগে গেলেন। তো এক ব্যক্তির রাতভর কান্নাকাটির উসিলায় আল্লাহ রব্বুল ইযযত মদদ ও সাহায্যের এমন এক নকশা কায়েম করলেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ তা স্মরণ রাখবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– (অর্থ:) 'কেউ আল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তো তাকে বলে দিন, তিনি অতি নিকটে। তিনি দু'আকারীর দু'আ কবূল করেন।' দু'আর ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার গায়বী মদদ আসে, প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলে যায় এবং আল্লাহও রাজি-খুশি হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলার রাজি-খুশি এতো বড় জিনিস যে, এর মধ্যে দুনিয়া-আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

প্রতিকূল হালত আসে আমলের প্রতিফল হিসেবে। বান্দা প্রতিকূল হালতকে নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত মনে করবে। প্রতিকূল হালতের নিসবত ও সম্পৃক্ততা কোন মাখলুকের সঙ্গে করা বড় রকমের ভুল।

প্রতিকূল হালতের সম্মুখীন হলে আমরা আমাদের আমলের ত্রুটি খুঁজে দেখব। যখন আমলের ত্রুটির ব্যাপারে আমাদের লজ্জা নসীব হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সহীহ তরীকায় কাজে লেগে যাওয়ার পোক্ত আযম করব, তো বান্দার নিজ ত্রুটির উপর লজ্জিত হওয়া আল্লাহ তা'আলার এতোটাই পছন্দনীয় যে, তাওবা-ইস্তিগফারের উসিলায় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বান্দার দোষ-ত্রুটি ভুলিয়ে দেন এবং ঐ যমীনকেও ভুলিয়ে দেন, যার উপর অবস্থান করে ভুল করা হয়েছিল।

মেহনত করনেওয়ালাদের উপরেই পরীক্ষা আসে। যখন কাউকে আগে বাড়ানোর ইচ্ছা করা হয়, তখনই তার উপর পরীক্ষা আসে। সুতরাং হালত যতো প্রতিকূলই হোক মেহনতের আমলে লেগে থাকলে হালত দুরুস্ত হয়, কাম করনেওয়ালাদের উন্নতি সাধিত হয়।

এটাও বিলকুল সঠিক যে, আমরা এমন কোন পন্থা অবলম্বন করবো না, যা আমাদেরকে (প্রশাসনিক) দায়িত্বশীলদের মোকাবেলায় ঠেলে দেয়। তবে কাম করনেওয়ালা যখন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করবে যে, (প্রশাসনিক) সমস্ত পাবন্দী ও নিয়ম-নীতির রেয়াত করে কাজ কতটুকু হতে পারে, কোন পন্থায় হতে পারে এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহরই প্রতি রুজু হয় তখন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাদেরকে রাহনুমায়ী করবেন, পথ প্রদর্শন করবেন। সকল আহবাবের খেদমতে মাসনূন সালাম ও দু'আর দরখাস্ত।

(স্বাক্ষর)

মাওলানা ইবরাহী দেওলা ছাহেব দা.বা.

মাওলানা নযরুর রহমান ছাহেব দা.বা.

মাওলানা ক্বারী যুবায়ের ছাহেব দা.বা.

আয়া সোফিয়াঃ ইতিহাস, পুনরুদ্ধার ও ঐতিহাসিক খুতবা

আয়া সোফিয়া। কুস্তুনতুনিয়ার আয়া সোফিয়া। তুরস্ক ও ইস্তাম্বুলের আয়া সোফিয়া। উম্মাহর হৃদয়ের স্পন্দন। এক মজলুম জায়নামায। কপালে তার লেখা হয়েছিল যাদুঘর শব্দের অসহ্য গ্লানি। আল্লাহর ঘর সিজদাবঞ্চিত পড়ে ছিল ৮৬টি বছর। অব্যক্ত দহন যন্ত্রণা সয়ে অবশেষে ফিরে পেয়েছে আপন অধিকার।

শুরুতে এটি ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের গির্জা। নির্মিত হয়েছিল নবীজীর আগমনের ৩৪ বছর পূর্বে। এটি কোন সাধারণ গির্জা ছিল না; ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি, বাইজান্টাইন শাসকদের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। নবীজী ভবিষদ্বাণী করেছিলেন– 'কুস্তুনতুনিয়া বিজিত হবে। কতই-না সৌভাগ্যবান সেই সেনাপতি! কতই-না বরকতময় সেই সেনাবাহিনী!!' এই ভবিষ্যদ্বাণীর বরকত লাভের আকাঙ্ক্ষায় সাহাবায়ে কেরামসহ যুগেযুগে মুসলিম শাসকগণ অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু তিনদিকে সাগর, একদিকে পাহাড় আর ৪০ ফুট উচ্চতা ও ৬০ ফুট চওড়া এই দুর্ভেদ্য দুর্গ পদানত করা সত্যিই অসাধ্য ছিল। তাছাড়া আল্লাহর খাতায় সবকিছুর জন্যই লেখা থাকে এক নির্দিষ্ট সময়।

১৫৫৩ সালের ২৯ জুলাই আল্লাহ তা'আলা উসমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের অকল্পনীয় রণকৌশলের উসিলায় আয়া সোফিয়া মুসলমানদের অধিকারে এনে দেন। নিয়ম হল, কোন অঞ্চল সন্ধির মাধ্যমে না হয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হলে সে অঞ্চলের স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির মালিকানা বিজয়ীদের অর্জিত হয়। ইস্তাম্বুল তথা আয়া সোফিয়া যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হওয়ায় ষড়যন্ত্র ও দাম্ভিকতার এই প্রতীকটিকে সুলতান নিয়মমাফিক মসজিদে রূপান্তর করেন। অতঃপর পরবর্তী কোন শাসক যেন এটিকে নিজ মর্জিমতো পুনরায় গির্জা বা অন্যকিছু বানাতে না পারে, এজন্য শাসক হিসেবে তিনি এটিকে রাষ্ট্রীয় ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করেন। এভাবে আয়া সোফিয়া মসজিদ হিসেবে চালু ছিল ৪৮২ বছর। কিন্তু ঘরের ইঁদুর, আস্তিনের সাপ কামাল পাশা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ১৯৩৫ সালে আয়া সোফিয়াকে যাদুঘর ঘোষণা করে। শুধু আয়া সোফিয়া-ই নয়, গোটা তুরস্কে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় আযান-নামায, ইসলামী রীতি-নীতি ও পরিভাষা। এমনকি তুর্কীভাষার লেখনপদ্ধতি আরবীলিপির পরিবর্তে ল্যাটিনলিপিতে রূপান্তর করা হয়। ইসলামপন্থীদের উপর চালানো হয় অবর্ণনীয় জুলুম-অত্যাচার। এ সময় মাথায় টুপি রাখার অপরাধে (?) কতশত মর্দে-মুমিনের মাথাটাই কেটে ফেলা হয়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু এতোকিছু করেও কি কামাল পাশা ইসলামের প্রতি তুর্কী মুসলমানদের অন্তরস্থ আবেগ ও ভালোবাসা নিশ্চিহ্ন করতে পেরেছে? পারেনি, কামাল পাশারা কোনদিনই পারে না। অত্যাচার যতো বৃদ্ধি পায় জনসাধারণের আবেগ ও অন্তর্জ্বালা ততোই উস্কে ওঠে। তারপর একসময় অগ্নিকুণ্ডের রূপ ধারণ করে অত্যাচারীর সকল অবাঞ্চিত স্বপ্নসৌধ ভস্মীভূত করে দেয়। আয়া সোফিয়ার ব্যাপারেও এমনটি ঘটেছে। সুদীর্ঘ ৮৬ বছর পর 'দ্বিতীয় ফাতিহ' প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগানের হাত ধরে আয়া সোফিয়া ফিরে পেয়েছে হৃত মর্যাদা। প্রায় নব্বই শতাংশ জনগণের মতামত নিয়ে ২০২০ সালের ১০ জুলাই তুর্কীআদালত এক ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেছে। সেখানে আয়া সোফিয়ার যাদুঘর পরিচয় বিলুপ্ত করে মসজিদ পরিচয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অতঃপর ২৪ জুলাই প্রায় ১৫ লক্ষ মুসল্লীর ঈমান-উদ্দীপক উপস্থিতিতে মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনির মধ্য দিয়ে জুমুআর নামায আদায় করা হয়েছে। তবে এরদোগান ও তুর্কী জনগণের এই বিজয় সহজসাধ্য ছিল না। এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে যুগ-যুগান্তের নীরব ত্যাগ ও প্রাণান্তকর সাধনা। আয়া সোফিয়া পুনরায় মসজিদে রূপান্তরের রায় ঘোষণার পর এরদোগানের একটি মন্তব্য আমাদের অন্তরে আশার সঞ্চার করেছে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য অন্যায্য দখলদারিত্ব থেকে আল-আকসার পুনরুদ্ধার; আয়া সোফিয়া তার প্রথম পদক্ষেপ।' প্রেসিডেন্ট এরদোগান! আপনাকে সশ্রদ্ধ সালাম। পরাক্রমশালী আল্লাহ আপনাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিন। তবে আমাদের কান্না শুধু আল-আকসা নিয়ে নয়, বাবরী মসজিদসহ পৃথিবীর সকল বে-দখল জনপদ ও মজলুম জনপদবাসীর জন্য।

উল্লেখ্য, আয়া সোফিয়ায় মুসলমানদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটা বিষয় খুব প্রচার পেয়েছে যে, সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ এটিকে খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ক্রয় করে অতঃপর মসজিদ হিসেবে ওয়াকফ করেছেন। কথা হল, আয়া সোফিয়ায় মুসলমানদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং এটিকে মসজিদ হিসেবে ওয়াকফ করা নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু 'খ্রিস্টানদের নিকট থেকে ক্রয়'-এর যে দাবী এবং যেটিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে, তা ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই সঠিক নয় এবং আয়া সোফিয়ার মসজিদ পরিচয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এর কোনই প্রয়োজন নেই। আয়া সোফিয়ায় মুসলমানদের মালিকানা কিভাবে প্রতিষ্ঠা হল এ বিষয়ে আল-জাজিরার বিশিষ্ট সাংবাদিক ড. মু'তায আল-খতীব চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। পাঠকের খেদমতে মু'তায আল-খতীবের সেই বিশ্লেষণ এবং আয়া সোফিয়ার উদ্বোধনী জুমু'আয় প্রদত্ত খুতবার অনুবাদ ইসলামটাইমস২৪ডট-কম-এর সৌজন্যে পেশ করা হল।

–সম্পাদক

আয়া সোফিয়ায় মুসলমানদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

–মু'তায আল খতীব

আয়া সোফিয়াকে জাদুঘর থেকে মসজিদে রূপান্তর করার প্রসঙ্গে তুরস্কের আদালত যে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কর্তৃক আয়া সোফিয়াকে মসজিদ হিসেবে ওয়াকফ করার যে দলীল রয়েছে– তার বিচার-বিশ্লেষণও সম্পন্ন হয়েছে। ১৬৮ পৃষ্ঠার প্রাচীন এই নথির সঙ্গে বেশ কিছু ছবিও সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান এ রায়ের বৈধতা দানের জন্য এই দলীলের উপর নির্ভর করেছেন। এই যুগান্তকারী রায়ের আইনগত এবং ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু দিক থেকে যেমন– ধর্মীয়, সংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিকভাবে এর পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আমি আমার পূর্বের একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, এটা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা কোন রাজনৈতিক ঘটনা নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোনো রায়ও নয়। কিন্তু

তারপরও বাস্তবে এই রায়কে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না। কেননা, কালের পরিক্রমায় সর্বদাই কোন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের উপযোগিতা বিবেচনা করার প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করা হয়। তবে কোনো মতাদর্শ রাজনৈতিক উপায়ে সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং জনমতের ভিত্তিতে যদি রায় প্রদান করতে হয় তাহলে তার জন্য একটি উপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন, যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয়। অতএব প্রতিটা রায় অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৈধতার মুখাপেক্ষী। সুতরাং আয়া সোফিয়াকে মসজিদ থেকে জাদুঘরে পরিবর্তন করার রায় বাতিল সাব্যস্ত করে জাদুঘর থেকে মসজিদে রূপান্তর করার আইনগত বৈধতা প্রমাণ করার জন্য কিছু দালীলিক প্রমাণপত্র উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

এই কর্মপন্থা প্রথমে উসমানী শাসনামলে এবং এরপর আধুনিক তুরস্ক গঠন হওয়ার পরেও অনুসরণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা যেন এই রায়ের আইনগত এবং ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি বিস্মৃত না হয়ে যাই। বরং এই রায় প্রদানের ক্ষেত্রে যে ফিকহী এবং শক্তিশালী আইনগত বৈধতা রয়েছে– যার সাথে রাজনীতির দূরতম সম্পর্কও নেই– তার প্রতি আমরা সজাগ দৃষ্টি রাখব। এ জন্যই আমি কিছু শাস্ত্রীয় তথ্যবহুল আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

ফিকহী ও আইনগতভাবে এই রায়ের বৈধতার দলীলের তিনটি রূপ হতে পারে:

এক. আয়া সোফিয়া সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তিনি এটা ওয়াকফ করে দিয়েছেন এবং তার মালিকানার প্রমাণপত্র তিনি ওয়াকফের রেকর্ডভুক্ত করেছেন। এরদোগান এই মালিকানা ও ওয়াকফ– এই দু'টিকে একত্র করে এই ফলাফলে পৌঁছেছেন যে, যদি এটা সুলতানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হতো তাহলে তিনি কিছুতেই আইনগতভাবে ওয়াকফ করতে পারতেন না। অতএব এটা রাষ্ট্রের বা কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি নয়।

দুই. যখন সুলতানের মালিকানা এবং ওয়াকফ সাব্যস্ত হয়ে গেলো তখন এখানে আর কোন প্রকারের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সুযোগ নেই। কেননা সে অধিকার একমাত্র ওয়াকফকারীর জন্য সংরক্ষিত। এর স্বপক্ষে দলীল হিসেবে এরদোগান তার বক্তব্যে বলেছেন, মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ওয়াকফের রেজিস্টারে একটি কঠিন বার্তা দিয়েছেন যে, 'যে আমার ওয়াকফকৃত মসজিদ আয়া সোফিয়াকে কোন প্রকার পরিবর্তন করবে, সে মারাত্মক অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর লা'নত।' এই ওয়াকফের তারিখ ১৪৫৩ ঈসায়ী।

তিন. মুহাম্মদ আল-ফাতিহ যখন ইস্তাম্বুল বিজয় করেন তখন তিনি রোমান সম্রাটের উপাধি ধারণ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বাইজান্টাইন রাজবংশের জন্য রেজিস্ট্রিকৃত সকল সম্পদের অধিকারী হন। অর্থাৎ, বাইজান্টাইন সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তাঁর কর্তৃত্বের ভিত্তিতে তিনি এর সকল সম্পদের মালিক হন। সুতরাং তিনি নিজ সম্পদে হস্তক্ষেপ করেছেন মাত্র; এর বেশি কিছু নয়।

এ সকল প্রমাণের উপর বেশ কিছু আপত্তি দেখা দেয়। প্রেসিডেন্ট এরদোগান এটাকে সুলতানের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওয়াকফ সাব্যস্ত করে 'রাষ্ট্রীয়' বলয়ের বাইরে নিয়ে 'ব্যক্তিগত' সম্পত্তির গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেছেন। তিনি এটা করেছেন কামাল আতাতুর্কের জাদুঘরে পরিণত করার রায়ের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য। আয়া সোফিয়াকে জাদুঘরে পরিণত করার যে রায় আতাতুর্ক সরকার দিয়েছিল তার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করতেই তিনি এই কাজটি করেছেন।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মুহাম্মদ আল-ফাতিহ যে শুধুমাত্র আয়া সোফিয়াই ওয়াকফ করেছিলেন তা নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে। আর এ ক্ষেত্রে সুলতানের দু'টি সত্তাগত দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে তার 'ব্যক্তিসত্তা' অপরটি হল তার 'শাসকসত্তা'। সুতরাং আমরা কিভাবে এই দুই 'সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের' মাঝে পার্থক্য করতে পারি অথচ যেখানে তার প্রতিটি ওয়াকফের মধ্যেই এই উভয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব রয়েছে? তিনি কি আয়া সোফিয়া কেবলই একজন ব্যক্তি হিসেবে ওয়াকফ করেছিলেন নাকি মুসলমানদের তৎকালীন সুলতান হিসেবে ওয়াকফ করেছিলেন?

দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন এখানে থেকে যায়। সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ বাইজান্টাইন সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তার মালিকানাধীন সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেছেন। তিনি এই রদবদল একজন 'ব্যক্তি' হিসেবে করেননি। যদি তাই করতেন তাহলে তার জন্য তা বৈধ হতো না। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে আয়া সোফিয়াকে ওয়াকফ করার যে কথা বলা হচ্ছে, তা এই বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। কেননা পূর্ববর্তী সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বর্তমান সুলতান এই সম্পদের মালিক হয়েছেন; কেবলমাত্র একজন 'ব্যক্তি' হিসেবে তিনি এই মালিকানা অর্জন করেননি। এমনকি বিজিত অঞ্চলসংশ্লিষ্ট (সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে হোক অথবা যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে হোক প্রতিটির বিধান ভিন্ন ভিন্ন) ইসলামী বিধান অনুযায়ীও পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় কোন সম্পত্তিতে ব্যক্তির হস্তক্ষেপ বৈধ নয়।

সুতরাং কিভাবে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ সেন্ট আয়া সোফিয়াকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গ্রহণ করে মসজিদের জন্য ওয়াকফ করতে পারেন! অথচ তিনি সর্বদাই বড় বড় আলেমদের এক জামাআতের সাহচর্য গ্রহণ করে এসেছেন।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'মাওলুদ জাওয়েস উগলু' এ বিষয়ে এরদোগানের সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্য করেছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, '১৪৫৩ ঈসায়ীতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য জয় এবং উসমানীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আয়া সোফিয়া উসমানী সালতানাতের মালিকানাধীন সম্পত্তিতে পরিণত হয়।' অর্থাৎ, তিনি আয়া সোফিয়াকে উসমানী সাম্রাজ্যের মালিকানাধীন সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে সুলতান আল-ফাতিহ-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। তবে এখানে রাষ্ট্রের ধারণাটা অস্পষ্ট। কেননা এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা তৎকালীন সময় বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং 'রাষ্ট্র' বলে নামকরণ করা হয়েছে এমন অঞ্চলে একজন রাষ্ট্রপক্ষের মালিক নির্ধারণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। এই মালিক কে হবে? রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মালিক কি সকল মুসলমান এবং সুলতান তাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত উকিল বা প্রতিনিধি হবেন, নাকি ব্যক্তিগতভাবে সুলতান-ই সম্পত্তির মালিক হবেন?

যদি আমরা সকল মুসলমানকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মালিক ধরে নেই তাহলে 'ব্যক্তিগত' ওয়াকফের আলোচনার পরিবর্তে 'শাসনকর্তা' হিসেবে ওয়াকফের বিধান নিয়ে আলোচনা করা উচিৎ, যার বৈধতা সকল ফুকাহায়ে কেরাম দিয়েছেন। তবে এর ব্যাখ্যায় তাঁদের কিছু মতভিন্নতা রয়েছে।

এই রায়ের ব্যাপারে কিছু অতিউৎসাহী ব্যক্তি এ কথা প্রচার করেছে যে, সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ আয়া সোফিয়াকে নিজ পয়সা দিয়ে ক্রয় করে ওয়াকফ করেছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ওয়াকফ করেছেন বলে যে কথাটা প্রচার করা হচ্ছে, তা থেকেই এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। এই রায় প্রকাশের পূর্বে এ ধরনের কথার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এর স্বপক্ষে কোন দলীল না ঐতিহাসিক

নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থে রয়েছে, আর না বর্তমানে যে সকল নথিপত্র পেশ করা হচ্ছে তাতে রয়েছে। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং ধারণাপ্রসূত। বরং প্রেসিডেন্ট এরদোগান তো বলেছেন যে, সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ বাইজান্টাইন সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সাম্রাজ্যের সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছেন। তাই যদি হয়, তাহলে সেই সম্পদ নতুন করে ক্রয় করার তো প্রশ্নই আসে না।

অধিকন্তু যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে অধিকৃত অঞ্চলের মালিকানা লাভের কি কি মাধ্যম হতে পারে তা ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্ট করে লিখেছেন এবং যুগের পর যুগ মুসলমানরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিজিত এলাকাসমূহে এর উপর আমল করেছেন। তাতে স্পষ্ট বলা আছে, বিজিত অঞ্চলের সম্পত্তির মালিক হওয়ার জন্য নতুন করে ক্রয় করার প্রয়োজন নেই। তবে অধিকৃত অঞ্চলের সম্পত্তির বন্টননীতি, মালিকানা পরিবর্তন এবং হস্তান্তর প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে।

মালেকী মাযহাবের অনুসারী আলেমগণ মনে করেন, মুসলমানরা কোন অঞ্চল যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করলে সেই এলাকার অধিবাসীদের সকল সম্পত্তি যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে মুসলমানদের মালিকানাধীন হয়ে যায়।

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেছেন, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ভার সুলতানের নিকট অর্পণ করা হবে। তিনি যদি চান তাহলে ওই অঞ্চলের মালিকানা তার অধিবাসীদের জন্য বহাল রাখবেন। এটা তাদের প্রতি অনুগ্রহ হবে। আর চাইলে তাদের থেকে নিয়ে মুসলমানদের দিয়ে দিতে পারেন। মোটকথা, যেখানে পরাজিত জাতির নিজেদের অঞ্চলের মালিকানা-ই থাকছে না সেখানে তাদের সাথে ক্রয়–বিক্রয়ের তো প্রশ্নই আসে না। এজন্যই ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে অধিকৃত অঞ্চলের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ক্রয়–বিক্রয় নিষেধ। কেননা, বিজয়ের মাধ্যমে এ সকল সম্পত্তি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ হয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্ট এরদোগানের বক্তব্যের আরেকটি অসঙ্গতিপূর্ণ দিক হল– তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কেবলমাত্র আয়া সোফিয়া-ই ওয়াকফ করেছেন এবং সেটা হয়েছে বিজয়ের বছরে। তবে যদি আমরা ওয়াকফের প্রচলিত আরবী অনুলিপিটি ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এই নথির শেষ পৃষ্ঠাটি নেই, যেখানে তারিখ উল্লেখ করা ছিল। এবং নথিটি পর্যালোচনা করলে আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আয়া সোফিয়ার ওয়াকফ বিজয়ের বছরের অনেক পরে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আমরা আরো লক্ষ্য করবো যে, তখন আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ওয়াকফ করা হয়েছিল। কোনোটা ছিল খ্রিস্টান রাজার সম্পত্তি আবার কোনোটা ইয়াহুদী শাসনকর্তার মালিকানাধীন। আর্মেনীয় সম্রাটের শাসনাধীন এলাকার স্থাপনাও রয়েছে এই ওয়াকফের তালিকায়।

মোদ্দাকথা হল, আমাদের হাতে যে অনুলিপি রয়েছে তার ভাষ্য অনুযায়ী বিজয়ের বছরের বেশ পরে উসমানী সালতানাতের ক্ষমতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হবার পর আয়া সোফিয়া ওয়াকফ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা প্রেসিডেন্ট এরদোগানের কথার সাথে বাস্তবতার কোন মিল পেলাম না। অতএব এই প্রসঙ্গে আমাদের নিকট সর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের ওয়াকফের যে আরবী অনুলিপিটি রয়েছে, তাতে শুধুমাত্র আয়া সোফিয়ার বিষয়টি উল্লেখ আছে এমন নয়। যদিও প্রথমেই আয়া সোফিয়াকে একটি 'সুরম্য গির্জা' উল্লেখ করে ওয়াকফের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আরও অবাক করা বিষয় হচ্ছে, এই নথিতে মসজিদ, মাদরাসা, অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়, বাজার-ঘাট, শস্যক্ষেত্র, চারণভূমি, ফসল প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত স্থান, হাসপাতালসহ সরকারী গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয় ও জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন স্থাপনা ওয়াকফের দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। এ সকল স্থাপনার অবস্থানস্থল, এর বৈশিষ্ট্যসমূহ, এগুলোর দেখাশোনায় নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের গুণাবলী, তাদের জন্য নির্ধারিত ভাতার পরিমাণ, এর থেকে যে মুনাফা আসবে তা ব্যয়ের খাত, সুলতানের জীবদ্দশায় এবং তার মৃত্যুর পরে এর পরিচালনাকারীর নাম এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের অনুপস্থিতিতে যারা দেখাশোনা করবে তাদের তালিকাসহ খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

ওয়াকফকেন্দ্রিক আলোচনায় আয়া সোফিয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বরং সুলতানের পক্ষ থেকে বিশাল ওয়াকফিয়া সম্পত্তির একটি অংশ মাত্র। তবে এরদোগান হয়তো আরবী অনুলিপি থেকে সূত্র উল্লেখ করতে গিয়ে আলাদাভাবে আয়া সোফিয়াকে বিশেষ একটি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ধরে নিয়েছেন। কেননা এই প্রচলিত আরবী অনুলিপির শুরুতে লেখা আছে, 'সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ-এর পক্ষ থেকে আয়া সোফিয়ার ওয়াকফনামা'। এমনিভাবে এই নথিটির শেষেই সুলতানের পক্ষ থেকে সেই কঠিন সতর্কবার্তাটি উল্লেখ রয়েছে, যা তিনি তার বিশাল ওয়াকফ সম্পত্তির মাঝে কোন প্রকার পরিবর্তনকারীদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন। অথচ এরদোগান এই হুঁশিয়ারীবার্তাকে শুধুমাত্র আয়া সোফিয়ার ব্যাপারে ধারণা করেছেন। সুতরাং সুলতানের ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা এই তালিকার সকল সম্পদের ক্ষেত্রে হওয়া উচিৎ।

ধারণা করা হয়, উসমানী সালতানাতের মধ্যে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের ওয়াকফ সম্পত্তি সর্ববৃহৎ এবং সুপ্রসিদ্ধ। এগুলোর সংখ্যা প্রায় ১৮২৮। এর মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাকেন্দ্র, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছাড়াও ১৩৪৫ টি ভূ-সম্পত্তি এবং স্থাপনা রয়েছে। এসকল ওয়াকফ সম্পত্তির দীর্ঘ তালিকাসূত্র এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি না।

তুরস্ক প্রজাতন্ত্র স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছে যে, সুলতান আল-ফাতিহের ওয়াকফকৃত সম্পত্তির তালিকা উসমানী ভাষায় ৩৭০ পৃষ্ঠায় নথিভুক্ত করা হয়েছিল। আমার ধারণা, আমরা এখন যে আরবী অনুলিপিটি দেখতে পাচ্ছি তা ওই মূল নথির অনুবাদ। আর এই ওয়াকফের ধারাবাহিকতা ১৪৬২/৬৩ ঈসায়ী মোতাবেক ৮৬৭ হিজরী থেকে ১৪৭০ ঈসায়ী মোতাবেক ৮৭৫ হিজরী পর্যন্ত চলমান ছিল। সুতরাং আয়া সোফিয়ার ওয়াকফ এর মধ্যবর্তী কোন এক সময় হয়েছে, যা বিজয়ের আনুমানিক নয় বছর পর।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের এই বিশাল ওয়াকফ সম্পত্তির তালিকা দেখলে এটা অবাস্তব বলে মনে হয় যে, তিনি এসব সম্পত্তি নিজস্ব মালিকানা থেকে অথবা ব্যক্তিগত পয়সায় ক্রয় করে ওয়াকফ করেছিলেন। বরং স্পষ্টতই বোঝা যায় তিনি সুলতান হিসেবে রাষ্ট্রীয় পদাধিকার বলে এসব সম্পত্তি ওয়াকফ করেছিলেন; তার ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে নয়।

ওয়াকফের নথিপত্রে এ জাতীয় কথা কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে– 'এই সম্পত্তি ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক যথাযথ প্রক্রিয়ায় সকল সংশোধনীসহ ক্রুটিমুক্ত করে চূড়ান্তভাবে ওয়াকফ করা হল।' আরেক জায়গায় বলা হয়েছে– 'মুজতাহিদ ইমামগণের শর্তের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখে কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ীভাবে এ সকল সম্পত্তি ওয়াকফ করা হল।' এবং বিচারপতি এই ওয়াকফের বৈধতা এবং চূড়ান্ত হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হয়েছে মর্মে

ফায়সালা দিয়েছেন। এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি সত্যায়ন করেছেন। আরো উল্লেখ আছে যে, 'এ সকল সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না, উপহার দেওয়া যাবে না, বন্ধক রাখা যাবে না, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এমন কোন কাজ করা যাবে না এবং কোনরূপ পরিবর্তন বা যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করা যাবে না।' এবং 'এ সকল সম্পত্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং চিরস্থায়ী নেয়ামত লাভের আশায় ওয়াকফ করা হল।'

এই বাক্যগুলো পড়লে যে কেউ নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবে যে, সুলতান আল-ফাতিহ ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান কতটা গুরুত্বের সাথে মেনে চলতেন। এখানের শব্দচয়ন থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, এই ওয়াকফ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী করা হয়েছে। কেননা হানাফী মাযহাবে দুই অবস্থায় ওয়াকফকে চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়।

এক. যখন বিচারকের ফায়সালার মাধ্যমে কোন কিছু করা।

দুই. যখন মসজিদ হিসেবে কোন কিছু ওয়াকফ করা হয়।

এখানে বারবার 'চূড়ান্তভাবে ওয়াকফ করা হয়েছে' বলে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বিচারপতির ফায়সালায় ওয়াকফের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আমি আগেই পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছি যে, এটা মুহাম্মদ আল-ফাতিহ সুলতান হিসাবে ওয়াকফ করেছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে নয়। আর এটা অসম্ভব যে, এত বিশাল সম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে সুলতানের মালিকানায় চলে আসবে। বাস্তবতা হল, কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের অল্প দিনের মধ্যেই সুলতান সকল স্থাপনাকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য ঘোষণা দিয়েছিলেন। যাতে তিনি এগুলোকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে বণ্টন করতে পারেন।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে অধিকৃত অঞ্চলে সম্পত্তির উপর সুলতানের পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে এসকল সম্পদ বিজয়ী জাতির মাঝে বণ্টন করে দিতে পারেন। আবার চাইলে ওই এলাকার অধিবাসীদের উপর ট্যাক্স ধার্য করে এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের থেকে ভূমিকর আদায় করার শর্তে তাদের মালিকানা বহাল রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে সুলতানের যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ ইমাম তহাবীর (মৃত্যু: ৩৭০) বক্তব্য থেকে এমনটাই বোঝা যায়। তৎকালীন আরেকজন হানাফী আলেম শায়েখ মোল্লা খসরু (মৃত্যু: ৮৮৫)-সহ অন্যান্য আরো বহু উলামায়ে কেরাম হুবহু এই মত ব্যক্ত করেছেন। কনস্টান্টিনোপলে আলেমদের বড় একটি জামাআত সুলতানের সাথে ছিলেন। সুলতান শায়েখ মোল্লা খসরুকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 'শাইখুল ইসলাম' বা ইসলামী জ্ঞানবৃদ্ধ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

অতএব কনস্টান্টিনোপল জয় করার পরপরই আয়া সোফিয়া ওয়াকফ করা হোক অথবা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি বণ্টন হওয়ার পর বাইতুল মাল (সরকারী কোষাগার) থেকে ওয়াকফ করা হোক; হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সর্বাবস্থাতেই বৈধ হবে। কেননা, সুলতানের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির আংশিক ওয়াকফ করার অথবা এর লভ্যাংশ মুসলমানদের কোন কাজে ব্যয় করার অধিকার রয়েছে। এমনকি বাইতুল মাল থেকে কোন সম্পত্তি ব্যাপক জনস্বার্থে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেয়াও সুলতানের জন্য বৈধ আছে। বিশেষ করে যদি পরবর্তী শাসনকর্তাদের ব্যাপারে এসব সম্পত্তি শরীয়ত পরিপন্থী উপায়ে ব্যবহারের আশঙ্কা করে সুলতান এগুলো চিরস্থায়ীভাবে ওয়াকফ করে দেন তাহলে তিনি সাওয়াবের অধিকারী হবেন।

হানাফী ফকীহ ইবনে আবেদীন শামী স্পষ্ট বলেছেন, 'ওয়াকফের কোন শর্তের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করা জায়েয নেই যদিও সেটা সরকারী কোষাগার থেকে সুলতানের পক্ষ থেকে ওয়াকফকৃত হোক না কেন।' কারণ, এই সুযোগ রাখলে পরবর্তীকালে কেউ অবৈধ ফায়দা গ্রহণ করবে।

আমরা সুলতানের ওয়াকফের-নথিতে দেখেছি, পরবর্তীতে এই অঞ্চলে দখলদারিত্ব চালাতে পারে এমন কেউ যেন তার ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মাঝে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে; এ ব্যাপারে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন এবং এই ওয়াকফকৃত সম্পত্তির স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কাজ ছাড়া কোন ধরনের পরিবর্তন না করার জন্য তিনি কঠোরভাবে আদেশ করেছেন। অন্যথায় জনস্বার্থ ব্যাহত হবে।

সুতরাং তিনি এ সকল জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিজয়ী শাসক 'আল-ফাতিহ' হিসেবে; ব্যক্তি 'মুহাম্মাদ' হিসেবে নয়। (অনুবাদ: আহমদ তামজীদ)

Avqv tmwdqvi HwZnwmK Lÿev
আজ বিনয় ও আত্মমর্যাদা প্রকাশের দিন

ঐতিহাসিক আয়া সোফিয়া মসজিদে দীর্ঘ ৮৬ বছর পর জুমু'আ আদায়ের মধ্য দিয়ে প্রথম নামায অনুষ্ঠিত হয়। জুমু'আর নামাযে ইমামতি করেন ধর্মমন্ত্রী প্রফেসর ড. আলী এরবাশ। উসমানী রীতি মোতাবেক কুরআনের আয়াত খচিত তরবারী হাতে নিয়ে ধর্মমন্ত্রী মিম্বরে আরোহন করেন। প্রথমে উপস্থিত মুসল্লীদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিলের দু'আ করে এরবাশ বলেন–

'মুবারক এই সময়ে পুণ্যময় এই স্থানে আমরা ঐতিহাসিক একটি সময় যাপন করছি। আয়া সোফিয়া ঈদুল আযহার একেবারে আগ মুহূর্তে, পবিত্র যিলহজ্জ মাসের তৃতীয় দিনে নামাযীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে। আজকের পর তুর্কী জাতির অন্তরে ব্যথা-বেদনায় রূপ নেয়া আয়া সোফিয়ার প্রতি আক্ষেপ দূর হবে। তাই প্রথমে মহান আল্লাহর অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি।

আজ আয়া সোফিয়ার গম্বুজ থেকে আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও দুরূদের মধুর ধ্বনি ভেসে আসার দিন। আযানের সুমধুর সুর আজ আয়া সোফিয়ার সুউচ্চ মিনার থেকে ইথারে পাথারে ছড়িয়ে পড়ার দিন। আজ খুশিতে চোখে আসা পানি নিয়ে নামাযে দাঁড়ানো, খুশু-খুজুর সাথে রুকুতে যাওয়া এবং কৃতজ্ঞতায় মহান আল্লাহর সামনে নিজেদের ললাট মাটিতে ঠেকানোর দিন। আজ বিনয় ও আত্মমর্যাদা প্রকাশের দিন। এমন একটি দিন আমাদেরকে উপহারদাতা, এই জগতের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান মসজিদে আমাদেরকে একত্রকারী ও পুণ্যময় ইবাদতগাহ আয়া সোফিয়াতে আমাদেরকে প্রবেশাধিকার প্রদানকারী পরক্রমশালী আল্লাহর অসংখ্য কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।

হাজারো দুরূদ ও সালাম সেই মহামানবের প্রতি, যিনি আনাগত আমাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে গেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়, 'কনস্টান্টিনোপল একদিন বিজয় হবেই। সে বিজয়ে নেতৃত্বদানকারী সেনাপতি কতই না উত্তম সেনাপতি এবং মহান সে বিজয়ের সৈনিকগণ কতই না উত্তম সৈনিক।' শত সহস্র সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুসংবাদের ভাগিদার হওয়ার জন্য পথে বেরিয়ে পড়া, ইস্তাম্বুলের আধ্যাত্মিক রাহ্‌বার আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি.-এর প্রতি। আরও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর অন্যান্য সাহাবী ও তাদের পথের অনুসারী তাবেঈদের প্রতি।

ইসলামে ফাতাহ ও বিজয়ের মর্ম– ভোগদখল নয়; আবাদ করা, ধ্বংস করা নয়; উৎকর্ষ সাধন করা। ইসলামের এই শিক্ষা বুকে ধারণ করে আনাদলুতে আগমনকারী সুলতান আলপ আরসালান ও এখানকার মাটিকে মাতৃভূমি হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের কাছে আমানত

হিসেবে রেখে যাওয়া শহীদ, গাজী ও ঈমানের নূরে এই ভূমিকে আলোকিতকারী আধ্যাত্মিক রাহবারদের প্রতিও হাজার হাজার সালাম। বিশেষভাবে রহমত বর্ষিত হোক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিশিষ্ট বুযুর্গ আখু শামসুদ্দীন রহ.-এর প্রতি, যিনি ফাতিহ সুলতান মুহাম্মাদের মনোজগতে বিজয়ের অঙ্কুর রোপণ করেছিলেন এবং পহেলা জুন ১৪৫৩ সনে এই আয়া সোফিয়াতে প্রথম জুমু'আর নামাযে ইমামতি করেছিলেন।

হাজারো সালাম ফাতিহ সুলতান মুহাম্মাদের প্রতি। যিনি আল্লাহর এই আয়াত থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন যে, (অর্থ:) 'কোনো বিষয়ে যখন পোক্ত ইচ্ছা করে ফেলো তখন কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করো। মূলত আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর ভরসাকারীদের পছন্দ করেন।' ফাতিহ সুলতান মুহাম্মাদ ছিলেন এমনই একজন। ফলে তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে ইস্তাম্বুল বিজয়ে সে যুগের সবচেয়ে উন্নত টেকনোলজি ব্যবহার করেছিলেন। জাহাযগুলোকে তিনি স্থল দিয়ে চালনা করেছিলেন। আল্লাহর উপর ভরসা ও তাঁর একান্ত সাহায্যের ফলে তিনি ইস্তাম্বুলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। বিজয়ী বেশে ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করে সুলতান মুহাম্মাদ এখানকার একটি পাথরকণাতেও ক্ষতিসাধন করার অনুমতি দেননি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। পাশাপাশি আয়া সোফিয়াকে মিনার দিয়ে সজ্জাদানকারী, জগদ্বিখ্যাত স্থাপত্যশিল্পী মি'মার সিনানের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শত বছর পরও আজ আয়া সোফিয়া স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর সাতমহাদেশের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম যে যেখান থেকেই আয়া সোফিয়াকে নতুন করে মসজিদ হিসেবে খুলে দেয়ার ফলে খুশি প্রকাশ করছেন– তাদের সবার প্রতি সালাম। সেইসঙ্গে আয়া সোফিয়াকে আজকের এ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যারাই শ্রম দিয়েছেন সবার প্রতি সালাম।

আয়া সোফিয়া পনের শ' বছর ধরে মানব ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। তাই এটি জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ইবাদতের অন্যতম মারকায। আয়া সোফিয়া মহান আল্লাহর দাসত্ব ও তাঁর কাছে নিঃশর্ত আনুগত্যের অন্যতম নিদর্শন।

ফাতিহ সুলতান মুহাম্মাদ চোখের মণি এই ইবাদতখানাটিকে কিয়ামত পর্যন্ত আবাদ রাখার জন্য মুমিনদেরকে আমানত হিসেবে ওয়াকফ করে গেছেন। মুসলিম হিসেবে আমাদের বিশ্বাস হল, ওয়াকফকৃত সম্পদে কারো হস্তক্ষেপ বৈধ নয়; ওয়াকফকৃত সম্পদের প্রতি প্রসারিত হাত পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ওয়াকফের শর্তগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ পূরণ করতে হয়। গাদ্দারী করলে আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়। সুতরাং ইতিহাস পরম্পরায় আয়া সোফিয়া কেবল তুর্কী জাতির মালাকানাধীন কোনো সম্পত্তি নয়; বরং এটা গোটা মুসলিম উম্মাহর সম্পদ। আয়া সোফিয়াতে ইসলামের ঐতিহাসিক সাম্যের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল সুলতান মুহাম্মাদের যবানে। ইস্তাম্বুল বিজিত হওয়ার পর প্রাণভয়ে আয়া সোফিয়ায় আশ্রয় নেয়া জনগণের সামনে ফাতিহ সুলতান মুহাম্মাদের আশ্বাসবাণী ছিল এই– 'আজকের পর থেকে আপনাদের স্বাধীনতা ও জান-মালের বিষয়ে কোনো ভয় থাকবে না। কারো সম্পদ লুণ্ঠন করা হবে না। কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের কারণে কাউকে শাস্তি দেয়া হবে না।' বাস্তবেও তিনি এমনটিই করেছিলেন। তাই এই আয়া সোফিয়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী ভিন্নধর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা, ঐক্য ও সংহতির নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

আয়া সোফিয়াকে নতুন করে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করার অর্থ হবে, দীর্ঘ পাঁচ শ' বছরের পুরোনো ঐতিহ্যে তাকে ফিরিয়ে নেয়া। আয়া সোফিয়ায় নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে গোটা জগত এই শিক্ষা লাভ করবে যে, একত্ববাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উত্তম আখলাকের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সভ্যতা কিছুটা নেতিয়ে পড়লেও সময়ের ব্যবধানে তা আবারো উৎকর্ষের চূড়ায় আরোহনের পথ খুঁজে বের করবে। আয়া সোফিয়ায় আযানের সমুধুর সুর উচ্চারিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাইতুল মাকদিসসহ পৃথিবীর অন্যান্য 'ব্যথিত' মসজিদগুলো ও সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরাত্মা কিছুটা হলেও শান্তি পাবে। মহান এই মসজিদকে নামাযীদের জন্য উন্মুক্ত করতে পারা তুর্কী জাতির ঈমান ও দেশপ্রেমের পরিচায়ক। তুর্কীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে ইশারা করছে তাদের এই অটল সিদ্ধান্ত। ইসলামী সংস্কৃতিতে মসজিদগুলো একতা, সংহতি, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পবিত্র কুরআনে মসজিদ আবাদকারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'মসজিদগুলোকে কেবল সে সব লোক আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, যাকাত প্রদান করে ও আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। মূলত এমন লোকদের ব্যাপারেই আশা করা যায় যে, তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।' যে মসজিদের মিনার থেকে আযানের ধ্বনি ভেসে আসে না, যে মসজিদের মিম্বরে কেউ আরোহন করে না, যে গম্বুজের নিচে গুণগুণ গুঞ্জরণ উঠে না, যে মসজিদের আঙ্গিনায় মুসল্লীদের পদাচারণা হয় না– তার চেয়ে কষ্টদায়ক দৃশ্য এই জগতে আর কী হতে পারে! ইসলাম বিদ্বেষীদের রোষানলে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে আজ বহু মসজিদের দরজায় তালা ঝুলছে। এমনকি বোমা মেরে মসজিদ উড়িয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটছে। মজলুম ও অসহায় মুসলিমরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাই দুনিয়াবাসীকে ফাতিহ সুলতান মুহাম্মাদের পাঁচ শ' বছর পূর্বে দেখিয়ে যাওয়া আদর্শ আজ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। গোটা মানবতার প্রতি, বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর চালানো জুলুমকে আজই 'থাম্' বলার সময় এসেছে।

আমাদের উচিৎ পুরো পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণতা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হওয়া। শত সমস্যায় জর্জরিত লোকদের আশ্রয়স্থল হওয়া। জুলুম, অন্যায়, অবিচার, আর্তনাদ ও অসহায়ত্বের অমানিশায় ছেয়ে যাওয়া ভূখণ্ডে ইনসাফের পতাকা উড্ডীন করা। নিম্নলিখিত আহ্বানে আমাদের সাড়া দেয়া উচিত, 'হে মুসলমান! ঈমানকে তুমি এতোটা মাধুর্য মিশিয়ে গ্রহণ করো এবং সে অনুযায়ী চলো যে, তোমাকে হত্যা করতে আসা লোকটিও ঈমানের দিশা পেয়ে যাবে।' ঈমানী এই বিপ্লব আমাদেরকেই শুরু করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভাষায়, 'মানব সন্তান হয় আমার দীনী ভাই, না হয় সৃষ্টিগতভাবে আমরা সবাই সমান।' আমরা আরও বিশ্বাস করি, মানুষ হিসেবে এই পৃথিবী আমাদের সম্মিলিত বসবাসের ঘর। তাই ভাষা, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী– যাই হোক না কেন, মানুষমাত্র আমরা সবাই দুনিয়া নামের এই ঘরের সদস্য এবং শান্তি নিরাপত্তা ও উত্তম আচরণ পাওয়ার হকদার। ফলে সবাই আপন ধর্মমত অনুসারে নিরাপত্তার সাথে বসবাসের অধিকার রাখে।

পুণ্যময় এই স্থানে দাঁড়িয়ে সমস্ত মানবতাকে লক্ষ্য করে বলতে চাই, 'হে মানব জাতি! আয়া সোফিয়া মসজিদ অন্যান্য মসজিদগুলোর মত আল্লাহর সকল বান্দাদের জন্য সদা খোলা থাকবে। আধ্যাত্মিকতা, ঈমান, আল্লাহর ইবাদত ও সৃষ্টির প্রতি গবেষণার ক্ষেত্রে আয়া সোফিয়ার অবদান অন্যান্য সময়ের মত এখনো চলমান থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ঐতিহ্যের সাথে মিশে থাকা হৃদয়ের স্পন্দন মহান এই ইবাদতখানার খেদমত করার তাওফীক দান করুন। এই মসজিদের যথাযথ মূল্যায়ন করার সৌভাগ্য আমাদের নসীব করুন।

(অনুবাদঃ আহমদ আমীন, তুরস্ক প্রবাসী)

সমসাময়িক প্রসঙ্গ

করোনার অজুহাতে অবরুদ্ধ হারামাইন: এ কোন ঈমান?

মাওলানা সাঈদুর রহমান মুমিনপুরী

গত ২৩ জুন সৌদি হজ্জ ও উমরা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দেয় যে, খুবই সীমিত সংখ্যক অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে এবারের হজ্জ অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে গিয়ে কেউই এবার হজ্জে অংশ নিতে পারবে না; শুধু সৌদিতে উপস্থিত বিভিন্ন দেশীয় লোকজনের নির্বাচিত অংশ আবেদনের ভিত্তিতে সেখানে অংশ নিতে পারবে।

বিবিসি বাংলার ২৩ জুন-এর সংবাদে বলা হয়েছে, মাত্র এক হাজারের কম মানুষ এবারের হজ্জে অংশ নিতে পারবেন!

এই ঘোষণার সাথে বরাবরের মতই অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে সৌদি আরবের 'হাইআতু কিবারিল উলামা'র সমর্থনও হজ্জ মন্ত্রণালয়ের টুইটের মাধ্যমে জানানো হল। সাথে এর যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে 'দারাতুল মালিক আব্দুল আযীয'-এর সাইট থেকে অতীতে মহামারীর কারণে হজ্জ বন্ধ হওয়ার বেশ কিছু ইতিহাস তুলে ধরা হল। পরবর্তীকালে যথাসময়ে সৌদি আরবে অবস্থানরত খুবই সীমিতসংখ্যক হাজীদের নিয়ে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়।

হজ্জপরবর্তী সময়েও বরাবরের মত উমরা ও যিয়ারাত প্রায় বন্ধ থাকে। ইদানিং গত ২৩ সেপ্টেম্বর সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের ঘোষণায় জানানো হয় যে, এখন থেকে চারটি ধাপে উমরা ও যিয়ারতের জন্য অনুমোদন দেওয়া হবে। প্রথম দুই ধাপে শুধুমাত্র সৌদি আরবের অধিবাসীরাই খুব সীমিত সংখ্যায় অনুমতি পাবে। (পর্যায়ক্রমে দৈনিক ছয় হাজার ও পনেরো হাজার উমরা আদায়কারী)। তৃতীয় ধাপে বাইরের দেশ থেকে অনুমোদন দেওয়া হবে, তা-ও নির্বাচিত দেশ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক। (দৈনিক বিশ হাজার উমরা আদায়কারী)। এরপর কবে পূর্ণরূপে ও স্বাভাবিকভাবে অনুমোদন দেওয়া হবে তার কোনো নিশ্চিত সময় নির্ধারিত নেই। যখন করোনা (সবার কল্পনা থেকে) শতভাগ বিদায় নেবে তখন এই অনুমতি পাওয়া যেতে পারে।

আলোচ্য প্রসঙ্গটি নিয়ে অনেক গুণীজন মুখ খুলেছেন ও কথা বলেছেন। এখানে যে ব্যাপারটি মৌলিকভাবে কাজ করেছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকারী মনে হচ্ছে। যুগে যুগে শাসকশ্রেণীর 'মাইন্ডসেট'-ই হচ্ছে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আসল নিয়ামক। এরপর এর পক্ষে প্রয়োজনীয় বিবৃতি ও সমর্থন ধরে-বেঁধে যুক্ত করা কোনো মহাসমস্যার বিষয় নয়!

শাসকশ্রেণীর মনস্তত্ত্বে জেঁকে বসা মানসিক দাসত্ব

আমরা এখানে সে ব্যাপারটিই দেখতে পাই। শাসকশ্রেণীর যে ব্যাপকতর প্রবণতা শতাব্দীকাল ধরে দৃশ্যমান তা হল, পশ্চিমা শক্তির মানসিক দাসত্ব। প্রযুক্তিতে ও শক্তিমত্তায় শতাব্দীকাল ধরে মোটামুটি একক বিজয়ী পশ্চিমাদের কাছে মাথা নুইয়ে ও আনুগত্য করে নিজের পরিসরকে সাজিয়ে নেওয়ার এক চক্র, যার ব্যত্যয় সামান্যই দেখা গেছে।

সেই পরম্পরায় যে সিদ্ধান্ত ওখান থেকে আসে, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুসলিম জাতির ঐতিহ্যগত রূহানিয়াত সম্বলিত ও তাওয়াক্কুলনির্ভর সিদ্ধান্তের ক্ষমতা এই শাসকদল হারিয়ে ফেলেছে।

ইসলামে রোগের সংক্রমণ চিন্তায় যে অসাধারণ ভারসাম্য ও স্বাভাবিকতা রয়েছে, এটাকে ধারণ করার মানসিক শক্তি পার্থিব শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে। ফলে যে কোনো সিদ্ধান্ত তাদের মত করে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ধর্মকে মিলিয়ে নেওয়া খুব সহজসাধ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এই নতজানু মানসিকতা থেকে উদ্ভূত 'মাইন্ডসেট' বড় অদ্ভুত। মানুষ অনেক কিছু রসিকতা করে বললেও এর বাস্তবতা থাকে। এসব সিদ্ধান্তের পিছনে করোনা ভাইরাস-সৃষ্ট পরিস্থিতিকে কারণ বলা হয়ে থাকে। মানুষ রসিকতা করে বলে, 'এই ভাইরাস খুব বুযুর্গ, হাটে-বাজারে যায় না; তবে মসজিদে আসে নিয়মিত।' ফলে সব সতর্কতা এসে থেমেছে মসজিদে। অন্যখানে মন চাইলে কিছু সতর্কতা নিয়ে বা সতর্কতা ছাড়াই সবকিছু সিদ্ধ, পক্ষান্তরে এখানে সবকিছু অসিদ্ধ।

করোনার আবির্ভাবের শুরু থেকেই যে বিষয়টি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল, মুসলমানদের নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের বিস্তর মাথাব্যথা। তার চেয়ে বড় সমস্যা হল, মুসলমানদের নিজেদেরই হীনম্মন্যতা– এই বুঝি মসজিদে করোনা আক্রমণ করে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল! এই বুঝি জুমু'আয় হানা দিল!

ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান United Kingdom National Health Service করোনাকালের শুরুতে দাবী করেছিল, মুসলমানরা করোনায় সর্বাধিক আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। কারণ মুসলমানদের পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়। তাছাড়া তারা মসজিদে যায়, জুমুআয় অংশ নেয়। তাই মেলামেশা বেশি হওয়ায় তাদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। ব্রিটেনভিত্তিক পত্রিকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট গত ১৯ মার্চ এ বিষয়ক একটি মতামত প্রকাশ করে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ব্রিটেনের সাবেক watchdog on community relations, the Equality and Human Rights Commission-এর প্রধান মি. ট্রেইভর ফিলিপস –যিনি উক্ত সংস্থার প্রধান থাকাকালে ইসলামোফোবিয়ার দায়ে অভিযুক্ত– তার নেতৃত্বে ওয়েবার ফিলিপস নামে একটি দল করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে সমীক্ষা চালায়। এরপর তারা জানায় যে, ইংল্যান্ডের মধ্যে অধিকহারে আক্রান্ত হয়েছে আফ্রিকান কালো ও এশিয়ান মাইনরিটি অধিবাসীরা; কিন্তু অদ্ভুতভাবে মুসলমান মাইনরিটি সম্পূর্ণই ব্যতিক্রম। যে সব অঞ্চলে মুসলমানদের তথা পাকিস্তানী ও বাংলাদেশীদের সংখ্যা বেশি সেখানে আক্রান্তের হার সবচেয়ে কম।

মি. ফিলিপস বলেন,

"If one key to stopping transmission of the virus is hand washing, might a faith community, many of whose members ritually wash before five times a day prayers, have something to teach the rest of us?"

'করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়াকে বন্ধ করার একটি চাবি যদি হয় হাতধোয়া, তাহলে একটি ধার্মিক গোষ্ঠী, যারা ধর্মীয় রীতি হিসেবেই দিনে পাঁচবার নামাযের জন্য হাত ধোয়, তাদের কাছে আমাদের কি কিছু শেখার নেই!'

ওয়েবার ফিলিপস প্রতিবেদনে জানায়,

The sharp difference between Muslim and other minority groups meant vulnerability is "far more likely to be environmental or behavioural".

'মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মধ্যে আক্রান্তের হারে এই সুস্পষ্ট পার্থক্যের কারণ তাদের পরিবেশগত বা আচরণগত অবস্থা।'

(এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আরব আমিরাত ভিত্তিক জার্নাল The nation-এ ২২ এপ্রিল ২০২০ প্রকাশিত British Muslims 'might have something to teach the rest of us' in curbing coronavirus নামক প্রতিবেদন)

এই হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। অথচ বহু মুসলিম এমনকি কতক পশ্চিমা মুসলিম স্কলারও ইসলামোফোবিক প্রথমোক্ত প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এই প্রতিবেদনে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি উঠে এসেছে তা হল, মুসলমানদের যে জীবনাচার ইসলাম শিখিয়েছে তাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান রয়েছে নিরাপত্তা, আত্মরক্ষা ও সুস্থতার উপকরণ। সুন্নতী জীবনযাপন নিঃসন্দেহে সর্বাধিক স্বাস্থ্যসম্মত; তবে আসল কারণ তথা রূহানিয়্যাত ও তাওয়াক্কুলের দিকটি তারা বলেনি, বলতে পারারও কথা নয়।

একদিকে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাওয়াক্কুল-নির্ভর আকীদা অন্যদিকে উৎকৃষ্ট রক্ষাকবচ সুন্নতী জীবনাচার। এ দু'টো মিলিয়ে মুসলমানদের সকল কর্মপন্থা নির্ধারণ করা উচিৎ। কিন্তু আকীদা ও সুন্নত দু'টোতেই তল্পীবাহক শাসকগোষ্ঠীর অনীহা। ফলে সারাবিশ্বের আগমনকারীদের জন্য হজ্জ ও উমরা বন্ধ করার এ রকম মাথামোটা সিদ্ধান্ত সৌদী শাসকগোষ্ঠী গ্রহণ করেছে এবং এভাবে বরাবরই গ্রহণ করে আসছে।

স্বার্থের সখ্য ও দাস-মনোবৃত্তি

এই শাসকগোষ্ঠীর শুরু থেকেই অদূরদর্শী ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিক পরম্পরা রয়েছে। ইতিহাসের পট পরিবর্তনগুলোতে তারা মোটামোটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তন্মধ্যে একটি বড় সিদ্ধান্ত ছিল, সৌদীর নিরাপত্তার নাম করে আমেরিকার সঙ্গে ১৯৭৩ ঈসায়ীতে করা পেট্রোডলার চুক্তি। যে চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকার অর্থনীতিকে দেওয়া হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা। ১৯৯০ সালে অদ্ভুত ইরাকভীতির নামে এবং মার্কিন কূটনীতির সরল শিকারে পরিণত হয়ে সৌদীতে পাঁচ লক্ষাধিক আমেরিকান সৈন্য আনা হয়, যা ছিল মুসলিম জাতির কলঙ্কজনক অধ্যায়। সৌদীর ভূমি রক্ষার জন্য অস্ত্রের কোনো অভাব ছিল না সৌদীর কাছে। অভাব ছিল জনবল ও প্রশিক্ষণের। এই অভাব পূরণে মুসলিম-বিশ্বে সহযোগীর কোনো ঘাটতি থাকার কথা নয়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, তখন চাহিবামাত্র সৈন্যপ্রত্যাহারের শর্তে মার্কিন সৈন্যদের অনুপ্রবেশ ঘটলেও আজও সেখান থেকে সম্পূর্ণরূপে সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়নি। উল্টো কী ঘটছে? মিডলইস্ট মিররের বরাত দিয়ে চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারী দৈনিক ইনকিলাব রিপোর্ট করে–

'সউদী আরবে অবস্থানরত মার্কিন সেনাদের খরচ বাবদ গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার দিল দেশটি।' আবার পড়ুন, ৫০০ মিলিয়ন ডলার! উপরের রিপোর্ট থেকে আরো পড়ুন–

'যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় কমাতে সউদী আরবের আর্থিক অনুদান প্রদানের ঘটনা এটিই প্রথম নয়। নব্বইয়ের দশকে ইরাকের বিরুদ্ধে ছয় মাসের উপসাগরীয় যুদ্ধের খরচ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে ৩৬০০ কোটি ডলার দিয়েছিল সউদী আরব ও কুয়েতসহ উপসাগরীয় দেশগুলো।'

২০১৭ এর জুন মাসে কাতার অবরোধের সিদ্ধান্ত এবং তৎপরবর্তী সময়ে তুরস্কবিরোধী ও ইজরাইলঘেঁষা রাজনীতি, জামাল খাশোকজীকে হত্যা তাদের এই আবহমান দাস-মনোবৃত্তি ও স্বার্থজনিত দুবৃত্তাচারের বহিঃপ্রকাশ।

তাদের ইজরাইলঘেঁষা কূটনীতির বিবরণ উঠে এসেছে ২৫ নভেম্বর ২০১৭ এর বিবিসি বাংলার রিপোর্টে। বিবিসির কূটনীতি ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংবাদদাতা জনাথন মার্কস লিখেছেন–

'তলে তলে এই দুটো দেশের মধ্যে কী হচ্ছে প্রায়শই তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গত সপ্তাহে ইসরাইলের চিফ অফ স্টাফ জেনারেল গাদি আইজেনকট যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক একটি সৌদি সংবাদপত্র এলাফকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ইরানকে মোকাবেলায় তার দেশ সৌদি আরবের সাথে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের জন্যেও প্রস্তুত রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের মধ্যে স্বার্থের মিল রয়েছে ইরানী-চক্র মোকাবেলার ব্যাপারে। আর এ ব্যাপারে আমরা সৌদি আরবের সাথেই আছি।'

এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য নমুনা তুলে ধরা হল। এ থেকে অনুমান করে নেওয়া কষ্টকর নয় যে, পশ্চিমাগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সখ্যতা কতো গভীর এবং তাদের সিদ্ধান্তগুলো কোন 'মাইন্ডসেট' বা মনস্তত্ব থেকে আসে। খুব পরিষ্কার যে, হারামাইনকে তারা এমতাবস্থায় নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধার হাতিয়ার বানিয়ে ফেলার পর্যায়ে চলে এসেছে। ফলে পূণ্যভূমিতে আমেরিকান সৈন্য আনার মত অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিতে যেমন তাদের কারো পরামর্শের ধার ধারার প্রয়োজন হয়নি, আজও তেমনি হারামাইন নিয়ে যাচ্ছেতাই সিদ্ধান্ত নিতে তাদের পশ্চিমের সামঞ্জস্য রক্ষার বাইরে অন্য কিছু ভাবার হিম্মত হয় না।

সংক্রমণ: আমেরিকান ঈমান

উপরের বিবরণ থেকে ঈমানের নবরূপ পরিষ্কার হয়ে যায়। তা হল, আমেরিকান ঈমান। বস্তুত মানবগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত তার বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ঈমান-বিল্লাহর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত একরকম হয়, আর আমেরিকান ঈমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত স্বভাবতই অন্যরকম হবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই যে সুস্পষ্ট বাণী, যা অনেক সাহাবীর সূত্রে অনেকভাবে বর্ণিত হয়েছে,

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

সংক্রমণ ধারণাকে এখানে খণ্ডন করা হয়েছে যে, ইসলামে সংক্রমণ বিশ্বাস নেই। এই সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলো মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, সংক্রমণকে দ্ব্যর্থহীনভাবেই নাকচ করেছে ইসলাম। যারা সংক্রমণকে স্বীকার করে এই বর্ণনাগুলোকে অন্যখাতে প্রবাহিত করতে চান তাদের বক্তব্যের তুলনায় এই ব্যাখ্যাটা এজন্যেই অধিক শক্তিশালী যে, এর সাথে যোগ হয়েছে খোদ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা। এখানে বাহ্যত সংক্রমণ ঘটতে দেখে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছেন, প্রথমটিকে কে সংক্রমিত করল! (সহীহ বুখারী হা.নং ৫৭১৭) এর সঙ্গে আরো যোগ হয়েছে হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর ব্যাখ্যা, যেখানে তিনি প্রচলিত অর্থে সংক্রমিত উট ক্রয় করে রেখে দেওয়ার সময় বলেছেন,

دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عَدْوَى

অর্থ: 'উটটি রেখে যাও, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফায়সালায় আমরা সন্তুষ্ট যে, সংক্রমণ নেই।' (সহীহ বুখারী ২০৯৯)

এর সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ব্যাখ্যা, যেখানে তিনি নবীজীর সংক্রমণ ধারণাকে সমর্থন করার ব্যাপারটি স্পষ্ট শব্দে নাকচ করে বলেন,

فقالت: ما قال ذلك، ولكنه قال: لا عدوى، وقال: فمن أعدى الأول؟ قالت: وكان لي مولى به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي، وينام على فراشي.

(তবারীর সূত্রে হাফেজ ইবনু হাজার রহ. এর ফাতহুল বারী ৫৭০৭নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

ফলে এই সংক্রমণকে নাকচ করার মত-ই সাধারণভাবে অধিকাংশ আলেম গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে রয়েছেন ইমাম মালেক, আবূ উবাইদ, তবারী, ইবনে খুযাইমা, ইমাম তহাবী থেকে শুরু করে বহু উলামা। (বিস্তারিত দেখুন ফাতহুল বারী, ৫৭০৭ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

এখানে একটি প্রশ্ন তোলা হয় যে, এই বক্তব্য অনুযায়ী বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হচ্ছে! বাস্তবে তো একজন থেকে অন্যদের সংক্রমিত হতে দেখা যায়!

এর উত্তর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই দিয়েছেন যে, প্রথমজনের যেভাবে হয়েছে পরেরজনের সেভাবেই হয়েছে। অর্থাৎ এই রোগের কারণ প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন এবং সে কারণ দ্বারা রোগ সৃষ্টি করেছেন। আসলে যে কোনো রোগের কারণ বা সববই কোনো না কোনোভাবে ছড়ায়। পানি, বাতাস, আবর্জনার মাধ্যমে ছড়ায়; হাঁচির মাধ্যমে ছড়ায়। সেই সবব/কারণ থেকে সতর্ক থাকার জন্য শরীয়তের শিক্ষা আলাদাভাবে আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখা, হাঁচিতে মুখে হাত দেয়া, চর্বি হাতে নিয়ে না ঘুমানো, অবৈধ যৌনমিলন না করাসহ রোগের আসবাব/কারণসমূহ থেকে বাঁচার সার্বিক নির্দেশনা ইসলামে আছে। রোগের আসবাব থেকে স্বাভাবিক সতর্ক থাকতে হবে; এটা ইসলামের শিক্ষা।

কিন্তু রোগ সংক্রমণ ভিন্ন জিনিস। রোগ আল্লাহর হুকুম হলে হবে; না হয় হবে না। রোগের আসবাবগুলো সর্বদা মানুষের ভেতরে বহুভাবে প্রবেশ করছে; কিন্তু রোগ হচ্ছে না। অর্থাৎ আসবাবগুলো রোগের কারণ বটে; কিন্তু খুবই দুর্বল কারণ। আগুন যেমন হাত পোড়ানোর শক্তিশালী সবব/কারণ, রোগের এই আসবাবগুলো তেমন নয়। সুতরাং রোগ হল হুকমুল্লাহ/আল্লাহর স্বতন্ত্র নির্দেশ। আর আগুনের পোড়ানো হল আদাতুল্লাহ/আল্লাহপ্রদত্ত রীতি। আদাতুল্লাহর ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা হবে সর্বোচ্চ মাত্রায়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে সতর্কতা হবে স্বাভাবিক; অতিকায় নয়। কারণ এগুলো দিয়ে রোগ দেয়া সম্পূর্ণই আল্লাহর হুকুম। এগুলো এমন সবব যে, রোগ হলে বলা হবে এটা রোগের কারণ। কিন্তু রোগ না হলে বলা হবে না যে, এটাই রোগের কারণ। আর আগুন দিয়ে পোড়ানো আল্লাহর আদাত। কাউকে যদি আল্লাহর হুকুমে না-ও পোড়ায় তবু বলা হবে আগুন পোড়ায়। কারণ পোড়ানোটাই তার আল্লাহপ্রদত্ত রীতি। যেহেতু রোগের সববগুলো রোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধ্রুব না, রীতিও না– এই কারণেই বলা হবে, রোগ ছোঁয়াচে না। প্রথমজনের যেমন আল্লাহর হুকুমে হয়েছে, পরেরজনেরও তাই।

প্রশ্ন হতে পারে, একই সময়ে মহামারী হয়ে অনেক মানুষের রোগ হওয়া থেকে তো বোঝা যায় সংক্রমণের দ্বারা রোগ হওয়া আদাতুল্লাহ বা আল্লাহপ্রদত্ত রীতি!

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, ব্যাপারটিকে কেউ আদাত বললেও তা আদাতে মুত্তারিদাহ বা মুসতামিররাহ নয়। অর্থাৎ সাধারণত এই কারণের দ্বারা রোগ হতে থাকবে বা একই সময় সবার হতে থাকবে তেমন নয়। বরং শুধু যতক্ষণ হুকুম আছে ততক্ষণের জন্য। যে কারণে দেখা যায়, আজ যেটাকে ছোঁয়াচে বলা হয় সেটা ক'দিন বাদে মানুষের শরীরে সয়ে যায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়; ফলে তাতে আর ব্যাপকতর রোগ হয় না –কলেরা তার জ্বাজ্জ্বল্য উদাহরণ– এমনকি যখন ব্যাপকভাবে হয় তখনও এটা বহু মানুষের হয় না। সে হিসেবে মহামারীকেও বলা যায় কিছুদিনের জন্য আল্লাহর হুকুম। আদাত বলার কোনো স্বার্থকতা বের করা মুশকিল।

সংক্রমণ নাকচ করার সাথে যেসব বর্ণনায় প্রচলিত অর্থে সংক্রামক রোগী থেকে দূরত্ব অবলম্বনের কথা পাওয়া যায়, তা মূলত দুর্বল ঈমানদারদের ঈমান রক্ষার স্বার্থেই। যেন কেউ দুর্গত এলাকায় গিয়ে আল্লাহর হুকুমে রোগাক্রান্ত হয়ে সংক্রমণের বিশ্বাস পোষণ করে ঈমান নষ্ট না করে।

এবার এই আলোচনা সামনে রেখে সামান্য চিন্তা করুন, যে বিষয়টি শুধু দুর্বলদের সহজীকরণ ও অবকাশ দানের জন্য, তা সবার উপর চাপিয়ে দেয়া আমেরিকান ঈমান ছাড়া আর কী? এই যে বিশাল সংখ্যক মানুষ হৃদয়ের আবেগ নিয়ে কত কষ্ট করে হজ্জের জন্য প্রস্তুতি নিল তা নিজেদের একক মাথামোটা সিদ্ধান্ত দিয়ে বন্ধ করার কোনো যৌক্তিকতা তো পাওয়া মুশকিল।

এছাড়া এখানে আরো লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রবলভাবে আক্রান্ত দেশগুলো যেমন ইতালী, স্পেন ইত্যাদি দেশগুলোতেও ইতোমধ্যে করোনা পরিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, আর অধিকাংশ মহামারী বসন্তকালে এসে গ্রীষ্মকালে সাধারণত বিদায় নেয়। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. মিশরে ৮৩৩ হিজরীর ভয়াবহ মহামারী বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

وكانت الطواعين الماضية تقع في فصل الربيع بعد انقضاء الشتاء وترتفع في أول الصيف.

অর্থ: 'অতীত মহামারীগুলো শীতের শেষে বসন্তকালে হতো, আর গ্রীষ্মের শুরুতে বিদায় নিতো।' (বাযলুল মাউন পৃ. ৩৬৯)

একদিকে সংক্রমণের ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান, অন্যদিকে অবস্থার পরিবর্তন সব কিছু মিলিয়ে তাদের সিদ্ধান্তকে আরো অযৌক্তিক করে দিয়েছে।

বন্ধ হওয়া আর বন্ধ করার গোলযোগ

এখানে 'দারাতুল মালিক আব্দুল আযীয'-এর প্রকাশিত হজ্জবন্ধের ঘটনাগুলো কেউ নিরপেক্ষভাবে পড়লে বুঝতে পারবেন যে, এসব ঘটনায় গণহারে হাজীদের মৃত্যুর কারণে হজ্জ এমনিতেই বন্ধ বা বন্ধের মতো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে এমন ভাষায় উপস্থাপন করা হল, যেন কাগুজে হিসেব-নিকেশ করে মহামারী প্রমাণিত হওয়ায় সরকারীভাবে বন্ধ করা হয়েছিল!

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কাগুজে হিসেব নিকেশ করে বন্ধ করা আর হাজীদের ব্যাপক মৃত্যুর কারণে ভীতি সঞ্চারিত হয়ে বা লোক-সঙ্কটের কারণে বন্ধ হওয়া দু'টো বিষয় কখনো এক নয়।

অনেক ক্ষেত্রে সমবেত লোকদের ব্যাপক মৃত্যুর কারণে সবাই ভীত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিবেশে বন্ধ ঘোষণা করারও একটি যৌক্তিকতা হয়তো থাকে, যা করোনা শুরুর সময়ে কিছুটা ছিল। (যে কারণে তখন বিভিন্ন দেশে উলামায়ে কেরাম জুমু'আ ও জামা'আত সীমিত করার অনুমতি দিয়েছিলেন।) এখন সে পরিস্থিতি নেই। বরং করোনায় আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মধ্যে, বরং অমুসলিম দেশের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা ও অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যেও আক্রান্ত ও মৃত্যুর স্পষ্ট পার্থক্যরেখা টেনে দিয়েছেন। কথিত মুসলিম-রাষ্ট্র ইরান ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম দেশেই করোনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি। এটা আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য কুদরত ও ঈমানদারদের উপর

রহমত ছাড়া কিছু নয়। অনুরূপভাবে সমবেত হওয়ার শরয়ী নির্দেশনা আছে এমন কোনো সমাগমের কারণে ইসলামধর্মীয় কোনো স্থানকে আল্লাহ তা'আলা বেইজ্জত করেননি। সুতরাং যে সকল মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী ভয়ে কুঁকড়ে ছিল ও আছে তাদের নিশ্চয় হাতে জুলুম ও রক্তের দাগ লেগে আছে। আমাদের আলোচিত দেশটির শাসকগোষ্ঠী মিশরে অন্যায়কর্ম ঘটাতে গিয়ে, ইয়েমেনে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে, নিজ দেশে মুক্ত মত প্রকাশের অপরাধে (?) বহু উলামাকে আটকে রেখে এবং কাফের জালিমদের অর্থায়ন করে নিজেদের হাতে যে পরিমাণ রক্ত লাগিয়েছে সে কারণেই আল্লাহ এদের উপর এক মহাভীতি চাপিয়ে দিয়েছেন।

গত ১০ই এপ্রিলের সময় নিউজ-এর সংবাদটি পড়ুন–

'করোনার ভয়ে প্রাসাদ ছেড়ে পালালেন সৌদি বাদশাহ-যুবরাজ!'

'মহামারী করোনাভাইরাসের আতঙ্কে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে জেদ্দায় নতুন ভবনে চলে গেছেন ৮৪ বছর বয়সী সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আযীয। বর্তমানে তিনি লোহিত সাগর উপকূলীয় শহরটির কাছে একটি আইল্যান্ড প্যালেসে অবস্থান করছেন বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস।

এ ছাড়া ৩৪ বছর বয়সী যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানও জেদ্দার এক প্রত্যন্ত এলাকায় চলে গেছেন। যেখানে ইতোমধ্যে তিনি 'নিওম' নামে একটি ভবিষ্যত-নগরী গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সৌদি রাজপরিবারের অন্তত দেড়শ' সদস্য করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলেন।

আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন রাজপরিবারের শীর্ষ সদস্য রিয়াদের গভর্নর প্রিন্স ফয়সাল বিন বান্দার বিন আব্দুল আযীয আলে-সৌদ। তিনি এখন নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) আছেন।

পরিস্থিতি সামলাতে ইতোমধ্যে মক্কা, মদীনা, রিয়াদ, জেদ্দা শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। সব ধরনের আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।'

আযাবের ভয়

মুমিনমাত্রই আল্লাহর আযাবের ভয় থাকবে। সাথে থাকবে রহমতের আশা ও তাওয়াক্কুল। কিন্তু অপরাধী হিসেবে যে আতঙ্ক তা ভিন্ন জিনিস। হাতে রক্তের দাগের কারণে সেই আতঙ্কই তাদের মাঝে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যার ফলে এই পলায়ন এবং এই সব অদ্ভুতুড়ে সিদ্ধান্ত। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

... فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي وَرَحْمَةٌ، وَرِجْسٌ عَلَى الْكَافِرِ.

অর্থ: '...মহামারী আমার উম্মতের জন্য শাহাদাত ও রহমত আর কাফেরদের জন্য আযাব।' (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২০৭৬৭। হাফেয ইবনে হাজার রহ. নিজের সনদে হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন, হাদীসটি হাসান। দ্র. বাযলুল মাউন পৃ. ৭৯)

ধর্মীয় বাতাবরণ

এ ধরনের শাসকগোষ্ঠীর সর্বকালের স্বভাব হল, এই সিদ্ধান্তগুলোকে ধর্মীয় পোশাক পরানো। হারাম শরীফের একজন খতীব শায়েখ সালেহ বিন হুমাইদ জুমু'আর খুতবায় এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করতে গিয়ে আশ্চর্য কথা বলেছেন। তিনি সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াত ومن دخله كان آمنا (যে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হয়ে যাবে।) উদ্ধৃত করে এর ব্যাখায় উলামায়ে কেরামের নাম নিয়ে বলেন যে, এর অর্থ হল– أمنوه অর্থাৎ যারা হারামে প্রবেশ করবে তোমরা তাদের নিরাপত্তা দাও। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, নিরাপত্তার জন্য তাদের হারামে প্রবেশ করতে দিও না, হজ্জ-উমরায় আসতে দিও না! কী অভিনব ব্যাখা, কী আশ্চর্য বিশ্লেষণ!! এই আয়াতের এরকম অদ্ভুত ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত তিনি ছাড়া অন্য কোন আলেম করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তার এই ব্যাখ্যা খোদ এই আয়াতেরই বিপরীত। আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, তাকে ক্ষতি করা যাবে না। কিন্তু এই শায়খের ব্যাখ্যা থেকে মনে হচ্ছে, কুদরতের হুকুমে মৃত্যু ঘটা থেকে দূরে রাখাও যেন তাদের দায়িত্ব। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

অর্থ: তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, মৃত্যু তোমাদের নিকট পৌঁছবে, যদিও তোমরা সুউচ্চ প্রাসাদে থাকো! (সূরা নিসা-৭৮)

এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, সরকার প্রভাবিত ফাতওয়াকে সরকার প্রভাবিত নন এমন আলেমদের ফতওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। তা না হলে ভুল বার্তাগ্রহণের বিস্তর আশঙ্কা থাকে। হারামাইনের খতীব হোন বা যিনিই হোন অবশ্যই চোখ বন্ধ করে এই ফাতওয়া গ্রহণ করার সুযোগ নেই। আবার তাদেরকে বাতিলপন্থী বলারও প্রয়োজন নেই; হয়তো তাঁদের কোনো ওযর থেকে থাকবে। কিন্তু কিছুতেই তাদের ফাতওয়া নিরপেক্ষ আলেমদের ফাতওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া ছাড়া গ্রহণীয় নয়।

শেষকথা

যে সকল নিরপেক্ষ আলেম বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন তারা একটি বিষয়ে জোর দিয়েছেন যে, হারামাইন মুসলিম উম্মাহর সামষ্টিক সম্পদ; এটি ভৌগলিক পরিধির ভেতরে পড়ে যাওয়ায় কারো একক অধিকার নয়। সুতরাং হারামাইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলো তারা এককভাবে নিতে পারেন না; সবার সঙ্গে পরামর্শ করে সারাবিশ্বের উলামায়ে কেরামের মতামত নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া কর্তব্য।

সে হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের উচিৎ ছিল, যে সকল ব্যক্তি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে হজ্জ-উমরা-যিয়ারতে না আসতে চায় তাদের জন্য সেই সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং অসুস্থ ও দুর্বলদের আসতে না দিয়ে অন্য সবার যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মানার ব্যবস্থা করে আসার পথ খোলা রাখা। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের জন্য যে রূহানী ও নৈতিক শক্তি দরকার তা আগেই তারা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে যথাসময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাদের আর হয়ে ওঠেনি!

লেখক পরিচিতি: মুদাররিস, মা'হাদুল বুহূসিল ইসলামিয়া, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

হালাল খাদ্য ও ই-কোড সম্পর্কিত শরয়ী বিধান

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

অর্থ: 'হে মানবসকল! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও উত্তম খাবার ভক্ষণ করো।' (সূরা বাকারা-১৬৮)

হাদীস শরীফে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ

অর্থ: 'এমন দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম আহার্য দ্বারা গঠিত হয়েছে।' (মুসনাদে বাযযার; হা.নং ৪৩, আল মু'জামুল আওসাত; হা.নং ৫৯৬১)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, একজন মুমিন-মুসলমান তার খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে চতুষ্পদ জন্তুর মত নয় যে, কোনো ধরনের বাছ-বিচার ছাড়াই যা মনে চাইবে, তাই সে খাবে; বরং তার জন্য এ বিষয়ে সচেতনতা আবশ্যক যে, তার শরীরে যেন কোনো হারাম খাদ্য প্রবেশ না করে।

খাদ্যদ্রব্য হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে সুনির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি আছে। আমাদের বাজারজাত পণ্যের হালাল ও হারাম নির্ণয়ের আগে সে সকল মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

প্রথম মূলনীতি :

الأصل في الحيوان الحل والأصل في اللحوم التحريم

অর্থ: 'ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোনো জীবিত প্রাণীর ব্যাপারে মূল হুকুম হল, তা হালাল।' অর্থাৎ কোনো জীবিত প্রাণীর হালাল কিংবা হারাম কোনো একটি হুকুমের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো দলীল পাওয়া না গেলে মূল হুকুমের ভিত্তিতে উক্ত প্রাণীকে হালাল মনে করা হবে এবং শরয়ী পদ্ধতিতে জবাই করে কিংবা (শিকারী প্রাণী হলে) শরয়ী পদ্ধতিতে শিকার করে তা খাওয়া বৈধ হবে।[১]

এর বিপরীতে প্রাণীর গোশ্‌তের মধ্যে এবং মৃত প্রাণীর মধ্যে মূল হুকুম হল, তা হারাম। অর্থাৎ কোনো মৃত প্রাণীর ব্যাপারে কিংবা গোশ্‌তের ব্যাপারে যদি সন্দেহ হয় যে, এ গোশ্‌ত শরয়ী পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে, নাকি তা মৃত প্রাণীর গোশ্‌ত– এরূপ সন্দেহের ক্ষেত্রে মূল হুকুমের ভিত্তিতে উক্ত গোশ্‌তকে হারাম মনে করা হবে এবং তা খাওয়া বৈধ হবে না।

উল্লেখ্য, গোশ্‌তের ক্ষেত্রে মূল হুকুম হারাম হওয়া মতটির ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামগণ সকলেই ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন। (হানাফী মাযহাব: হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন ৬/৪৯২, মালেকী মাযহাব: ইবনুল আরবী, আহকামুল কুরআন ২/৩৫, শাফেয়ী মাযহাব: ইমাম নববী, শরহু সহীহিল মুসলিম ১৩/১১৬, হাম্বলী মাযহাব: ইবনে কুদামাকৃত আল-মুগনী ১৩/১৮)

হালাল ও হারাম প্রাণীর প্রকারভেদ

শরয়ী দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবে জলজ ও স্থলজ প্রাণী হালাল ও হারাম হওয়ার বিষয়টিকে ফুকাহায়ে কেরাম কয়েকভাগে ভাগ করেছেন।

জলজ প্রাণীর হুকুম

মাছ ছাড়া অন্য সকল জলজ প্রাণী হারাম। কেননা, জলজ প্রাণীর মধ্যে কেবল মাছ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণের আলোকে শরীয়তে হারাম করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মাছ ছাড়া অন্যান্য জলজ প্রাণী খাওয়া হারাম হলেও তা নাপাক নয়। কেননা, পানিতে জন্মগ্রহণকারী প্রাণীর মধ্যে রক্ত থাকে না। আর যে সকল প্রাণীর শরীরে রক্ত নেই সেগুলো মরলে নাপাক নয়। কাজেই কাকড়া যে তেলে ভাজা হয়েছে, সে তেলে যদি মাছ ভাজা হয় (এবং তাতে কাঁকড়ার কোনো অংশ না থাকে) তবে তা খাওয়া জায়েয হবে।

স্থলজ প্রাণীর হুকুম

■ স্থলজ প্রাণীর মধ্যে যেগুলোর শরীরে রক্ত নেই তা খাওয়া জায়েয নয়। যেমন: মশা, মাছি। তবে টিড্ডি এর ব্যতিক্রম। কেননা, টিড্ডি হালাল হওয়ার বিষয়টি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

■ যে সকল স্থলজ প্রাণীর শরীরে রক্ত আছে, কিন্তু প্রবহমান নয় তা খাওয়াও বৈধ নয়। যেমন: টিকটিকি।

■ যে সকল স্থলজ প্রাণীর দেহে প্রবহমান রক্ত আছে সেগুলো যদি অধিকাংশ সময় তৃণভোজী হয় তবে সে সকল প্রাণী হালাল; চাই তা গৃহপালিত হোক বা বন্য হোক। যেমন: গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, বকরী, দুম্বা, খরগোশ, বন্য গরু, বন্য গাধা, বন্য উট ইত্যাদি।

তবে এ সকল হালাল প্রাণীর 'গোশ্‌তের' মধ্যে মূল শরয়ী বিধান যেহেতু হারাম হওয়া, কাজেই যতক্ষণ না শরয়ী পদ্ধতিতে জবাই/শিকার করা হবে, ততক্ষণ তা খাওয়া জায়েয হবে না।

উল্লেখ্য, শরীয়তের দৃষ্টিতে জবাই সহীহ হওয়ার জন্য কয়েকটি আবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে। যথা–

১. আল্লাহর নামে 'বিসমিল্লাহ' বলে জবাই করতে হবে।

২. ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যনালী, শ্বাসনালী এবং দুই রক্তনালী– এ চার নালীর যে কোনো তিনটি কাটতে হবে।

৩. জবাইকারী প্রাপ্তবয়স্ক, বুঝসম্পন্ন এবং মুসলমান বা আহলে কিতাব হতে হবে।[২]

উল্লেখ্য, আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করে এবং প্রকৃত খ্রিস্টধর্ম বা ইয়াহুদী ধর্মের মৌলিক আকীদায় বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তি। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা হল, যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বা ইয়াহুদী দাবী করে থাকে, তাদের অধিকাংশই নাস্তিক! অর্থাৎ তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না।

---

(١) الموسوعة الفقهية (١٨/ ٣٣٦): "ما يتأتى أكله من الحيوان يصعب حصره، والأصل في الجميع الحل في الجملة إلا ما استثنى فيما يلي:
الأول الخنزير، واختلفوا فيما عداه من الحيوان: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع: ولا ذي مخلب من الطير الثاني: ما أمر بقتله كالحية، والعقرب، والفأرة، وكل سبع ضار كالأسد، والذئب، وغيرهما مما سبق.الثالث: المستخبثات: فإن من الأصول المعتبرة في التحليل والتحريم: الاستطابة، والاستخباث. والأصل في ذلك قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) ، وقوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات)" انتهى من الموسوعة.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الأصل في اللحوم هو الحل أوالتحريم؟ فأجاب: الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل، والأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم أويغلب على ظننا أنها مباحة..." انتهى من لقاء الباب المفتوح (٢٣٤/ ٩) والله أعلم.

২. অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা এবং পাগল ব্যক্তি যদি এতটুকু বুঝতে সক্ষম হয় যে, 'বিসমিল্লাহ দ্বারা জবাইকৃত প্রাণী হালাল হয় এবং জবাই হল খাদ্যনালী, শ্বাসনালী, দুই রক্তনালী'র যে কোনো তিনটি কাটার নাম'– তাহলে তার জবাইকৃত প্রাণীও হালাল হবে। (ফাতহুল কাদীর ৮/৪০৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৮/২২৭)

আর খ্রিস্টান ধর্ম বা ইয়াহুদী ধর্মের সাথেও তাদের আদৌ কোনো বন্ধন নেই। তাছাড়া জবাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত দুই শর্তের পাবন্দীও তারা করে না। কাজেই নামকাওয়াস্তে এ সকল খ্রিস্টান বা ইয়াহুদীদেরকে আহলে কিতাব মনে করে তাদের জবাইকৃত গোশ্ত খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। (ফাতাওয়ায়ে শামী ৬/২৯৭, মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. রচিত 'বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসারা' গ্রন্থের أَحْكَامُ الذَّبَائِحِ وَاللُّحُوْمِ الْمُسْتَوْرَدَةِ প্রবন্ধ)

* যে সকল প্রাণী দাত দ্বারা কিংবা নখ দ্বারা শিকার করে খায়, তা খাওয়া জায়েয নয়; চাই তা গৃহপালিত হোক বা বন্য হোক। যেমনঃ কুকুর, বিড়াল, বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, বনবিড়াল, শিয়াল ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী।

* তেমনিভাবে যে সব পাখি পাঞ্জা দ্বারা শিকার করে খায় সেগুলো হারাম। যেমন: শকুন, বাজপাখি। পক্ষান্তরে যেগুলো অধিকাংশ সময় তৃণভোজী বা শস্যভোজী তা হালাল।

* যে সকল প্রাণী অধিকাংশ সময় হারাম বস্তু ভক্ষণ করে কিংবা নাপাক বস্তু খায় সে সকল প্রাণী খাওয়াও জায়েয নয়। যেহেতু তাতে হারামের মিশ্রণ আছে। যেমনঃ নাপাক-আবর্জনা খায় এমন কাক। (হালাল ও হারাম প্রাণীর প্রকারভেদের ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন- 'আল মাওসূআতুল ফিক্হিয়্যাতুল কুওয়াইতিয়্যাহ ৫/১২৪)

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা : বিদেশ থেকে আমদানীকৃত গোশ্তের বিধান

এ বিষয়ে একটি মূলনীতি হল যে, 'মুসলিম দেশ থেকে আমাদানীকৃত হালাল প্রাণীর গোশ্ত মুসলমানদের প্রতি সুধারণাবশত হালাল মনে করা হবে। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হবে যে, এ প্রাণীটি কোনো মুসলমান জবাই করেছে এবং হালাল পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে। এর বিপরীতে যদি অমুসলিম দেশের গোশ্ত হয়, তবে সাধারণ ধারণামতে সে গোশ্ত হালাল হবে না। কেননা, অমুসলিমদের জবাইকৃত গোশ্ত হালাল নয়।'

ফুকাহায়ে কেরাম যদিও উপরিউক্ত মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বর্তমানে বাস্তবতা হল, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদার কারণে স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণ প্রাণী জবাই করার নিমিত্তে রপ্তানীকারক মুসলিম/অমুসলিম সব দেশেই তৈরি হয়েছে Slaughterhouse বা যান্ত্রিক কসাইখানা। যেখানে প্রাণী জবাইয়ের পত্যক্ষ কর্মে কোনো মানুষের সহযোগিতা ছাড়াই আধুনিক পদ্ধতিতে মেশিনের সাহায্যে এক মুহূর্তেই হাজার হাজার প্রাণী জবাই করা হয়। কিন্তু আপত্তির বিষয় হল, এ সকল কসাইখানায় সাধারণত জবাই সহীহ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শরয়ী শর্তসমূহ লক্ষণীয় থাকে না। কেননা–

১. বেশিরভাগ কসাইখানায় বিসমিল্লাহ সহকারে একজন মুসলমান কর্তৃক প্রত্যক্ষ জবাই সম্পাদন করা হয় না; বরং একইসাথে হাজারো মুরগী জবাই হতে থাকে, আর বেশির চেয়ে বেশি একজন মুসলমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহ বলতে থাকে। অথচ প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য প্রতিটি প্রাণীকে জবাইকালে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিসমিল্লাহ বলা শর্ত।

২. অনেক কসাইখানায় মুরগীকে জবাই করার আগে ইলেক্ট্রিক সংযোগ সমন্বিত বরফ শীতল পানিতে ডুবানো হয়। বিশেষজ্ঞদের মত হল যে, এই ঠাণ্ডা পানিতে ৯০ পার্সেন্ট মুরগীর হৃৎক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়!

৩. মেশিনে দ্রুত জবাইকালে প্রাণী হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে যে শিরাগুলো কাটা আবশ্যক, অনেক মুরগীর ক্ষেত্রেই তা যথাযথ হয় না।

৪. অমুসলিম দেশ থেকে আগত গোশ্তের ব্যাপারে এ সুধারণা করা সম্ভব নয় যে, কোনো মুসলমানই বিসমিল্লাহ বলে জবাই করেছে।

৫. বড় প্রাণী যেমন গরু, মহিষ ইত্যাদি জবাই করার ক্ষেত্রে আধুনিক কসাইখানাগুলোতে প্রথমে জানোয়ারকে নিষ্ক্রীয় করা হয়। নিষ্ক্রীয়করণের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। মুসলিম বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রীয় করার সময়ই জানোয়ার মারা যায়! সেক্ষেত্রে হাতে জবাই করলেও তা হালাল হবে না!

সারকথা, বহির্বিশ্বের মুসলিম/অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত যে কোনো গোশ্তের মধ্যে উপরিউক্ত সমস্যাগুলো থাকা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই ভোক্তা সাধারণের লক্ষণীয় হল, আমদানীকৃত গোশ্ত ক্রয়ের সময় যদি তা মুসলিম দেশের হয় এবং হাতে জবাইকৃত লেখা থাকে, তবে তা হালাল হবে। যদি মেশিনে জবাইকৃত লেখা থাকে, তবে হারাম। যদি জবাই পদ্ধতি লেখা না থাকে, শুধু হালাল লেখা থাকে এবং তা কোনো নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সত্যায়ন সম্বলিত হয়, তবে তা খাওয়াও জায়েয হবে।

আর অমুসলিম দেশের গোশ্তের ক্ষেত্রে কেবল নির্ভরযোগ্য কোনো মুসলিম সংগঠনের 'হালাল' সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ক্রয় করা যাবে। (আমদানীকৃত গোশ্তের হুকুমের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. রচিত 'বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসারাহ' গ্রন্থের أَحْكَامُ الذَّبَائِحِ وَاللُّحُوْمِ الْمُسْتَوْرَدَةِ প্রবন্ধ।)

দ্বিতীয় মূলনীতি :

সাধারণ খাদ্যপণ্যের মধ্যে মূল শরয়ী বিধান হল 'হালাল হওয়া'। অর্থাৎ খাদ্যপণ্য হালাল মনে করা হবে, যতক্ষণ না তাতে হারাম হওয়ার কোনো কারণ পাওয়া যায়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

অর্থ: 'তিনিই (আল্লাহ) সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের (উপকারের) জন্য সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা বাকারা-২৯)

উল্লিখিত আয়াতের কারণে ফুকাহায়ে কেরামের মত হল, পৃথিবীতে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্ট সব কিছু মানুষের জন্য বৈধ। এ আয়াতের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম নিম্নোক্ত মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন–

أصل الاشياء الإباحة

অর্থ: '(মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্ট) সকল বস্তুর ব্যাপারে শরীয়তের প্রথম বিধান হল, তা বৈধ।'

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবনে আবিদীন রহ. ফাতাওয়ায়ে শামী গ্রন্থে বলেন,

مطلب المختار أن الأصل في الأشياء الإباحة:
أقول: وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اهـ

কাজেই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খাদ্যপণ্যও মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্ট। কাজেই প্রাণী (জীবিত) এবং অন্যান্য খাদ্যপণ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে মৌলিকভাবে হালাল। কাজেই কোনো প্রাণী বা অন্যান্য খাদ্যপণ্য হারাম হওয়ার জন্য শরীয়তের ভিন্ন দলীল আবশ্যক হবে।

বর্তমান বাজারজাত পণ্য হালাল নাকি হারাম?

বর্তমান বাজারে যে সকল খাদ্যপণ্য পাওয়া যায়, উৎসের ভিত্তিতে সেগুলোর উপকরণকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

১. প্রাণী থেকে আহরিত উপকরণ।

২. কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থের উপকরণ।

৩. উদ্ভিদ থেকে আহরিত উপকরণ।

৪. অ্যালকোহল, যা মাদকদ্রব্য থেকে আহরিত হয়।

৫. মিক্সড ফুড বা প্রসেসড ফুড, যা প্রাণী কিংবা অ্যালকোহলের মিশ্রণে তৈরি করা হয়।

উল্লিখিত **প্রথম মূলনীতির** আলোকে প্রাণী থেকে আহরিত উপকরণের ব্যাপারে শরয়ী বিধান হল, যে প্রাণী থেকে আহরণ করা হয়েছে, যদি তা হারাম প্রাণী হয়, অথবা হালাল প্রাণী কিন্তু (মাছ ও টিড্ডি ব্যতীত) শরয়ী পদ্ধতিতে জবাই করা হয়নি, তবে এ জাতীয় প্রাণী থেকে আহরিত উপকরণ পানাহারে ব্যবহার করাও হারাম হবে।

উল্লিখিত **দ্বিতীয় মূলনীতির** আলোকে রাসায়নিক পদার্থ ও উদ্ভিজ উপকরনের বিধান হল যে, সম্পূর্ণ হালাল, যদি তাতে নাপাকীর মিশ্রণ না থাকে এবং কোনো উপায়ে তা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও নেশার কারণ না হয়।

আর চতুর্থ প্রকার খাবারের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম হল, যে অ্যালকোহল আঙ্গুরের কাঁচা রস, কিংবা খেজুরের রস দ্বারা তৈরি করা হয়, তা নাপাক। যদ্দরুন তা খাওয়াও হারাম। কেননা, তা নাপাক এবং তাতে খাদ্যপণ্য হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ নেশাযুক্ত হওয়া (Intoxication) পাওয়া যায়। যেমন মদ। আর যদি আঙ্গুর কিংবা খেজুর দ্বারা তৈরিকৃত না হয়, তবে তা নাপাক নয় এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে তা খাওয়া এবং ব্যবহার করা জায়েয হবে।

মিক্সড ফুড বা প্রসেস্‌ড ফুড

বর্তমান বাজারে এমন অনেক খাবার পাওয়া যায়, যা প্রাণী, কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ, উদ্ভিদ, অ্যালকোহল– এই চার প্রকার উৎসের কোনো একটি থেকে এককভাবে তৈরি করা হয় না; বরং তা একাধিক উৎসের উপকরণ সমৃদ্ধ হয়। আলোচ্য শিরোনামে 'মিক্সড ফুড বা প্রসেসড ফুড' দ্বারা এমন খাবারই উদ্দেশ্য। ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ ইং তারিখে 'খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা ২০১৭' শিরোনামে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের বর্ণনামতে **'খাদ্য সংযোজন দ্রব্য'** অর্থ 'বিশেষ উদ্দেশ্যে খাদ্যের সহিত সংযোজিত কোন বস্তু, যাহা সাধারণত মূল আহার্য হিসাবে ভক্ষণ করা হয় না, তবে বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদান হিসাবে কারিগরী প্রয়োজনে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কাবৃত-করণ বা সংরক্ষণের নিমিত্তে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রত্যাশিত উপযোগিতা প্রাপ্তির জন্য, খাদ্যে ব্যবহৃত হয় এবং দূষক বা অন্য কোন মিশ্রিত পদার্থের অন্তর্ভুক্তি ব্যতিরেকেই খাদ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য মূল খাদ্যের বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে।'

এ সকল খাদ্য উপকরণের 'উৎস' প্রাণী, কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ, উদ্ভিদ ও অ্যালকোহল-এ চার প্রকার উৎসের কোনো একটি কিংবা একাধিক হয়ে থাকে। কাজেই-কোনো খাদ্যপণ্যকে হালাল বা হারাম বলতে হলে সংযোজিত উপকরণের ভিত্তিতে নয়; বরং উপকরণের 'উৎসে'র ভিত্তিতে বলতে হবে।

মিক্সড ফুডের বিধান জানার আগে একটি মূলনীতি জানা আবশ্যক। আর তা হল– যখন হালাল খাদ্যবস্তুর মধ্যে হারাম বস্তু মিশ্রিত হবে, তখন তার হুকুম কী হবে? যেহেতু হারাম বস্তুর কারণ ভিন্ন হওয়ায় তার মিশ্রণের হুকুমও পরিবর্তন হবে, কাজেই ঐ সকল মূলনীতির আলোচনাও অপরিহার্য, যেগুলোর কারণে শরীয়তে কোনো খাদ্যপণ্য হারাম করা হয়।

খাদ্যপণ্য হারাম হওয়ার শরয়ী মূলনীতি

১. مضر للصحة (Harmfulness) তথা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়া

অর্থাৎ কোন জিনিস তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষের দ্বীনের জন্য কিংবা জ্ঞান ও মস্তিষ্কের জন্য, অথবা জানের জন্য কিংবা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হওয়ার বিষয়টি যখন দৃঢ়ভাবে জানা যাবে, তখন তা হারাম হবে। যেমন বিষ, যা মানুষের প্রাণের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর; চাই তা কোনো প্রাণী থেকে আহরিত হোক বা কোনো বিষাক্ত উদ্ভিদ থেকে হোক। অনুরূপভাবে মাটি, বালি, পাথর, ছাই ইত্যাদি। এগুলো বিষ তো নয়; কিন্তু শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হওয়ায় হারাম।

উল্লেখ্য, কোন বস্তুটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর, আর কোনটি ক্ষতিকর নয়– তা নির্ধারিত হবে শরীয়তের বর্ণনা দ্বারা বা ডাক্তার ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বক্তব্য দ্বারা।

২. السكر (Intoxication) অর্থাৎ নেশাজাতীয় হওয়া

নেশাগ্রস্ত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মানুষের মস্তিষ্ক এবং ইন্দ্রীয়শক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া।

৩. استخباث (Filthiness) অর্থাৎ সুস্থরুচিবোধ কর্তৃক ঘৃণিত হওয়া।

'ঘৃণিত' হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, একজন সৃষ্টিগতভাবে সুস্থরুচিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে কোনো বস্তুর আহার করা ঘৃণিত হওয়া। যেমনঃ পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার।

৪. النجس (Impurity) অর্থাৎ নাপাক হওয়া। চাই তার মৌলিকত্বই নাপাক হোক। যেমন রক্ত। অথবা বস্তুটি মূলত পাক; কিন্তু কোনো নাপাকীর মিশ্রণে তা নাপাক হয়েছে এমন হোক। যেমন তরল ঘি, যাতে ইঁদুর পড়ে মারা যায়।

৫. کرامت (Human Dignity) অর্থাৎ মানবীয় সম্মানের অধিকারী হওয়া।

কারামাত দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো বস্তু মানবীয় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া। মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে সর্বাধিক সম্মানিত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে মানবদেহের কোনো অংশ খাওয়া কিংবা কোনো হালাল খাদ্যবস্তুতে মিশ্রণ করা এবং তা খাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম।

হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন, (দ্র. বেহেশতী যেওর; ৯/৯৮ মীর কুতুবখানা)

جاننا چاہیے کہ شریعت مطہرہ میں استعمال کے منع ہونے کی وجہیں چار ہیں: نجاست، مضر ہونا، استخباث یعنی طبیعت سلیمہ کا اس سے گھن کرنا، جیسے کیڑے مکوڑے میں، اور نشہ لانا۔

কোনো জিনিস যখন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে, তখন তা নাপাক হওয়া আবশ্যক নয়। যেমন বিষ শরীরের জন্য ক্ষতিকর; কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, সব বিষই নাপাক হবে। তেমনি যে জিনিস নাপাক হবে, তা নেশাযুক্ত হওয়া আবশ্যক নয়। তেমনি যে জিনিস সম্মানিত হবে, তা ক্ষতিকর কিংবা নাপাক হওয়াও আবশ্যক নয়। অর্থাৎ যে কোনো বস্তু হারাম হওয়ার জন্য একাধিক কারণ যেমন থাকতে পারে, তেমনি এককভাবে কোনো একটি কারণও থাকতে পারে।

(খাদ্যপণ্য হারাম হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন– বাদায়িউস সানায়ে ১/১৮৬, হিন্দিয়া ৫/৩৪, ওয়াহবাহ যুহাইলিকৃত আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৪/২৫৯৪, আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহতুল কুওয়াইতিয়্যাহ ৫/১২৫)

মিক্সড ফুডের শরয়ী হুকুম

হালাল বস্তুর সাথে হারাম বস্তুর মিশ্রণের পর হালাল বস্তুর হুকুম নিম্নরূপ হবে–

১. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ হয় 'ক্ষতিকর হওয়া (Harmfulness), তাহলে উক্ত হারাম বস্তু কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে মিশ্রণ করার পর তার ক্ষতিকর দিক যদি পূর্ববৎ বহাল থাকে তবে উক্ত হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যাবে। আর যদি মিশ্রণের কারণে তার ক্ষতি দূর হয়ে যায় তবে উক্ত হালাল বস্তু খাওয়া জায়েয হবে।

এ ব্যাপারে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, (বেহেশতী যেওর ৯/৯৮)

اگر مضر چیز کا نقصان کسی طرح جاتا رہے یا منشی میں نشہ نہ رہے تو ممانعت بھی نہ رہیگی

এর উদাহরণ হল বিষ; চাই তা প্রাণীর হোক বা উদ্ভিদের। বিষ যেহেতু মানব শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, কাজেই তা হারাম। কিন্তু এই বিষ কোনো ঔষধের সাথে মিলানোর পর যদি তার ক্ষতিকর প্রভাব অবশিষ্ট না থাকে বরং ঔষধের জন্য উপকারী হয়, তবে তা খাওয়া হারাম হবে না।

২. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ কারামাত তথা মানবীয় সম্মান হয় অর্থাৎ মানব শরীরের কোনো অংশ যদি কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে মিশ্রণ করা হয়, তবে উক্ত মিশ্রণ অল্প হোক কিংবা বেশি হোক–উক্ত হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যাবে।[১]

৩. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ 'নেশা' হয়, তবে দেখতে হবে যে, উক্ত বস্তুটি তরল নাকি শুষ্ক? যদি উক্ত নেশার বস্তুটি শুষ্ক হয়, তবে কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে মিশ্রণের পর তার নেশার প্রভাব দূর হয়ে গিয়ে থাকলে উক্ত হালাল বস্তু খাওয়াও জায়েয হবে। আর যদি উক্ত নেশার বস্তুটি তরল হয়, তবে দু' ধরনের হতে পারে–

(ক) আঙ্গুর বা খেজুর দ্বারা তৈরিকৃত হারাম চার প্রকার মদের কোনো একটি হলে উক্ত হালাল বস্তুটিও হারাম হয়ে যাবে; চাই মিশ্রণ অল্প পরিমাণে হোক বা বেশি পরিমাণে, এবং মিশ্রণের পর তাতে নেশার প্রভাব অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক।

(খ) যদি তরল বস্তুটি আঙ্গুর বা খেজুরের না হয়, তবে শুষ্ক বস্তুর মতই তার হুকুম হবে অর্থাৎ মিশ্রণের পর যদি নেশার প্রভাব অবশিষ্ট থাকে, তবে হারাম হবে অন্যথায় হালাল হবে।

উল্লিখিত হুকুম থেকে ঐ সকল ঔষধের হুকুমও বুঝে আসে, যাতে অ্যালকোহল মেশানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ সকল ঔষধও খাওয়া হালাল হবে, যদি তাতে আঙ্গুর বা খেজুরের মদ থেকে তৈরি অ্যালকোহল না থাকে এবং তার মধ্যে নেশার কোনো প্রভাব না থাকে।

৪. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ 'ঘৃণিত হওয়া' হয়, তবে দেখতে হবে যে, উক্ত বস্তু মিশ্রিত কোনো খাবারের ব্যাপারে সুস্থরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঘৃণা সৃষ্টি হয় কি না? অনেক সময় খবীস জিনিসের সামান্য অংশের মধ্যেও 'ঘৃণাভাব' হয়ে থাকে। যেমন কোনো সুস্থ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি জানতে পারলো যে, বড় এক কলসি পানির মধ্যে একটি তেলাপোকা মরে পানিতে মিশে গেছে। যদিও এখানে খবীস বস্তুর পরিমাণ কম এবং উক্ত খবীস বস্তুর দরুন পানির রং, স্বাদ, গন্ধ কোনোটিই পরিবতন হয়নি, তথাপি স্বাভাবিকভাবেই সে উক্ত পানি পান করতে ঘৃণা বোধ করবে। আবার কখনো কখনো খবীস বস্তু কম হলে ঘৃণাভাব হয় না; বরং বেশি হলে হয়। যেমন, বড় এক ডেগ বিরিয়ানীর মধ্যে একটি পিঁপড়া পড়ে গেল। খুবই স্বাভাবিক কথা যে, এ খাবার খেতে কেউ ঘৃণা করবে না। কাজেই উক্ত পিঁপড়া দেখা গেলে ফেলে দিতে হবে এবং অবশিষ্ট বিরিয়ানী খাওয়া জায়েয হবে।

সারকথা, কোনো হালাল খাবারের মধ্যে যদি এত সামান্য পরিমাণ 'খবীস' বস্তু মেলানো হয়, যাতে সুস্থ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয় না, তবে তা হারাম হবে না; অন্যথায় হারাম হবে। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ফতোয়াগ্রন্থ ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে (৫/৩৩৯) বলা হয়েছে–

دُودُ اللَّحْمِ وَقَعَ فِي مَرَقَةٍ لَا تَنْجُسُ، وَلَا يُؤْكَلُ الدُّودُ، وَكَذَا الْمَرَقَةُ إِذَا انْفَسَخَتْ الدُّودَةُ

এ ব্যাপারে হযরত থানবী রহ. বলেন,

اسی طرح سرکہ کو مع کیڑوں کے کھانا یا کسی معجون وغیرہ کو جس میں کیڑے پڑ گیے ہوں مع کیڑوں کے کھانا یا مٹھائی کو مع چیونٹی کے کھانا درست نہیں ہاں کیڑے نکال کر درست ہے۔

'খবীস' তথা সুস্থরুচিবোধের নিকট ঘৃণিত বস্তু মিশ্রিত মিক্সড ফুডের শরয়ী হুকুম

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত উদাহরণগুলোতে গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, 'খবীস' বস্তুর দ্বারা কোনো হালাল খাবার হারাম না হওয়ার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম যে উদাহরণগুলো উল্লেখ করেছেন তা মূলত এমন 'অনিচ্ছাকৃত ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা থেকে বেঁচে থাকা সাধারণত কষ্টসাধ্য এবং সেই 'খবীস' বস্তুর পরিমাণও যৎসামান্য।' উদাহরণস্বরূপ এক ডেগ বিরিয়ানী রান্না করতে গিয়ে যদি বাতাসে উড়ে এসে একটা পিঁপড়া ডেগের ভেতর পড়ে যায়, আর এ কারণে খাবারকে হারাম বলে দেওয়া হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই মানুষকে এই সাধ্যাতীত দুর্ভোগ থেকে বাঁচানোর জন্য শরীয়ত এ সামান্য পরিমাণের অবকাশ দিয়েছে।

কিন্তু চিন্তার বিষয় হল, বর্তমানে বিভিন্ন খাবারে যে খবীস বস্তু মেশানো হয়, তা কোনো অনিচ্ছাকৃত ঘটনা নয় এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভবও নয়। কেননা, উদাহরণত প্যাকেটজাত কোনো কোনো খাবারের গায়ে লেখা থাকে, E120 যা মূলত Cochineal (টকটকে লাল রঞ্জক) ও Carminic Acid (এসিড বিশেষ) বোঝায়। আর এ Cochineal ও Carminic Acid তৈরি করা হয় Insect তথা বিশেষ ধরনের একটি পোকা থেকে। এ জাতীয় 'খবীস' পোকামাকড় থেকে খাদ্য-সংযোজনদ্রব্য উৎপাদন যে এখন একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে, তা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিমাত্রই জানেন। তাছাড়া Cochineal ব্যবহৃত হয় খাবারের লাল রঞ্জক হিসেবে। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ রং খাবারের প্রতিটি অংশেই দৃশ্যমান হয়! কাজেই খবীস জিনিসের পরিমাণ মিক্সড ফুডে নিতান্ত কম হওয়ার যুক্তি এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়ত, আজকাল মানুষ Carminic Acid -যুক্ত খাবার খায়, কারণ সে জানে না যে, এ উপকরণটি Insect থেকে তৈরি করা হয়েছে। যদি সে জানতো যে, তার সামনে পরিবেশিত খাবারে পিঁপড়ে পিষে রং করা হয়েছে, তবে বলাই বাহুল্য যে, কোনো সুস্থ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি তা খেতে ঘৃণাবোধ করবে।

সারকথা, বিরিয়ানীর ডেগে অনিচ্ছাকৃত পিঁপড়া পড়ে যাওয়ার উদাহরণের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে 'খবীস' বস্তু মিশ্রণের এই 'খবীস শিল্প' কে জায়েয বলার কোনো অবকাশ নেই। এ কারণেই বর্তমানে মিক্সড ফুডের মধ্যে যদি এ জাতীয় কোনো পোকামাকড় বা অন্য কোনা 'খবীস' দ্রব্য থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে হারাম হবে!

৫. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ নাপাকী হয়, অর্থাৎ কোনো নাপাক বস্তু কোনো হালাল বস্তুর সাথে মেশানো হয়–যেমন শুকর, যা শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নাপাক, যদি হালাল তরীকায়ও শুকর জবাই করা হয়, তবুও তা পাক হবে না। কাজেই কোনো খাদ্যবস্তুর মধ্যে যদি শুকরের কোনো অংশ মিশ্রিত হয়, তবে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে; যদিও তাতে শুকরের রং, স্বাদ, ঘ্রাণ অবশিষ্ট না থাকে।

---

১. প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. বলেন– (দ্র. আল বাহরুর রায়িক; ১/২৪৩)
جلدة آدمي إذا وقعت في الماء القليل تفسده إذا كانت قدر الظفر

উল্লেখ্য, কোনো খাদ্যপণ্যের মধ্যে নাপাক বস্তু– চাই নাপাকীর পরিমাণ কম হোক বা বেশি– মিশ্রণ করা যেমন জায়েয নেই, তেমনি নাপাক বস্তু মিশ্রিত খাবার খাওয়াও কারো জন্য বৈধ নয় এবং এ জাতীয় নাপাক বস্তুর মিশ্রণে তৈরি প্রসাধনী ব্যবহার করাও জায়েয নয়। হ্যাঁ, যখন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোনো নাপাক বস্তু অল্প পরিমাণে হালাল বস্তুর মধ্যে মিশে যায় এবং এ মিশ্রণ থেকে সাধারণত বেঁচে থাকাও সম্ভব না হয় তবে নাপাক বস্তুর রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ উক্ত হালাল বস্তুতে প্রকাশ না পাওয়ার শর্তে নাপাকী ফেলে দিয়ে উক্ত হালাল বস্তু খাওয়া জায়েয হবে। যেমন, ছাগলের দুধ দোহন করার সময় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তাতে ছাগলের দু'একটি বিষ্ঠা পড়ে যায় এবং তা সাথে সাথে বের করে ফেলা হয়, তবে নাপাকীর রং, স্বাদ, ঘ্রাণ প্রকাশ না পাওয়ার শর্তে উক্ত দুধ খাওয়া বৈধ হবে। কেননা, দুধ দোহনের সময় এ জাতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে বেঁচে থাকা সাধারণত কষ্টসাধ্য।

মৌলিকত্ব পরিবর্তনের পর হারাম বস্তু মিশ্রণের শরয়ী হুকুম

হারাম বস্তু মিশ্রণের যে পাঁচটি সূরত উপরে বর্ণিত হয়েছে, এ সকল হুকুম ঐ সময়, যখন মৌলিকত্ব পরিবর্তন ছাড়াই কোনো হারাম বস্তুকে হালাল বস্তুতে মেশানো হয়। এর বিপরীতে যদি (যে কোনো কারণে) হারাম বস্তু যখন রাসায়নিক কিংবা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তার মৌলিকত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার পর মেশানো হয় কিংবা মেশানোর পর তার মৌলিকত্ব বিলীন হয়ে যায়, তখন তার হুকুমও পরিবর্তন হয়ে যাবে, অর্থাৎ তা হালাল হয়ে যাবে।

ফুকাহায়ে কেরাম এর যে প্রকৃষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করেছেন তা হল, আঙ্গুর বা খেজুরের শরাব নাপাক; কিন্তু এ নাপাক বস্তুটি যখন লবণ মেশানোর দরুন সিরকা হয়ে যাবে তখন পাক হয়ে যাবে। তেমনি গাধা লবণের খনিতে পড়ে লবণ হয়ে গেলে উক্ত লবণ খাওয়াও জায়েয আছে।

এখন অনুসন্ধানের বিষয় হল যে, বর্তমানে বাজারে যে সকল প্রসেসড ফুড বা মিক্সড ফুড পাওয়া যায় তাতে যে রসায়নিক পরিবর্তনের পর হারাম বস্তু মেশানো হয়; এতে উক্ত হারাম বস্তুর মৌলিকত্ব পরিবর্তন হয় কি না? বিষয়টি খাদ্য ও রসায়নসংশ্লিষ্ট এক্সপার্টদের মাধ্যমেই অবগত হওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে আমাদের অবগতি হল, প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হারাম বস্তুর গুণাগুণ পরিবর্তন হয় ঠিক; কিন্তু তার মৌলিকত্ব পরিবর্তন হয় না। কাজেই হারাম বস্তুর মৌলিকত্ব পরিবর্তনের ভিত্তিতে হারাম বস্তু মিশ্রিত মিক্সড ফুডকে এককথায় হালাল বলার কোনো সুযোগ নেই।

ই-কোড সম্পর্কিত শরয়ী বিধান

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রবের গায়ে বেশ কিছু বিষয়ের তথ্য প্রদান করা উৎপাদনকারীর জন্য জরুরী। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য আইন **'লেবেলিং'**[১] এর নিয়ম অনুযায়ীও প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের মোড়কে খাদ্যপণ্য সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাবলী উল্লেখ করা আবশ্যক। তবে অনেক সময় খাদ্যউপাদান বা খাদ্য-সংযোজনদ্রব্য বোঝানোর জন্য কোড বা নম্বর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বাজারে প্যাকেটজাত যে সব পণ্য পাওয়া যায়, তার অনেকগুলোর লেবেলে[২] উপাদান অংশতে কিছু ই-কোড (E code) বা 'ই-নম্বর' দেয়া থাকে। এগুলো আমাদের জন্য আদৌ উপকারী নাকি ক্ষতিকর– ভোক্তাসাধারণ তা জানেন না।

এই ই-কোড-এর ব্যাপারে বিপরীতমুখী বক্তব্য রয়েছে। যেমন, কারো কারো মতে, 'ই-কোডগুলো শুকরের নির্দেশ করে। অর্থাৎ ই-কোড মানে হল, সংশ্লিষ্ট খাদ্যপণ্যে শুকরের কোনো না কোনো অংশ মিশ্রণ করা হয়েছে। আর শুকর যেহেতু নাপাক, তাই খাদ্যপণ্যটিও নাপাক বিবেচিত হবে এবং তা খাওয়া ভোক্তার জন্য হালাল হবে না!'

মূলত এ বক্তব্যের ভিত্তি এ বিষয়ের উপর যে, ই-কোড মানেই হল 'শুকরের কোনো অংশ'। কিন্তু ই-কোড-মাত্রই শুকরের নির্দেশ করে কি না, এ সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ফাতাওয়া বিভাগ এবং হালাল ফুড এক্সপার্টদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হই।[৩] তাছাড়া বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের কতিপয় ডাক্তারদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকেও আমরা সাহায্য নিয়েছি।

ব্যক্তিগত যথাসাধ্য অনুসন্ধান এবং উল্লিখিত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে ই-কোডের বাস্তবতা সম্পর্কে যে তথ্যাবলী আমাদের সামনে এসেছে, তা এরূপ–

'ই-কোড' মৌলিকভাবে শুকরের নির্দেশ করে না; বরং ই-কোড মূলত European Economic Community (EEC) কর্তৃক স্বীকৃত খাদ্য-সংযোজনদ্রব্য বিশেষের (রাসায়নিক বা প্রাকৃতিক খাদ্যের অংশ, রং, স্বাদ, বা রুচি বাড়ানোর উপাদান) নির্দেশিকা, যা নির্দিষ্ট কোড বা নম্বর দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের প্রাথমিক সময়ে যখন বিভিন্ন ধরনের খাদ্যউপাদান রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে রূপান্তর করা হতো যে, তার উৎস সম্পর্কে ভোক্তার ধারণা লাভ করা সম্ভব হতো না তখন প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের গায়ে সকল খাদ্যউপাদান লেখা আবশ্যক করে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে যখন এক দেশের পণ্য অন্য দেশে আমদানী-রপ্তানী হতে লাগলো তখন বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সমন্বয়ে আন্তজাতিক বাজার তৈরী হল। ফলে অঞ্চলভিত্তিক ভাষার বিভিন্নতার দরুন প্যাকেটের গায়ে খাদ্যপণ্যের একটি নির্দিষ্ট নাম সকল অঞ্চলের মানুষের জন্য অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য হয়ে গেলো। এ অবস্থায় ভাষার বিভিন্নতায় খাদ্য-সংযোজনদ্রব্য বুঝতে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে খাদ্য-সংযোজনদ্রব্যগুলোকে–যা সাধারণত প্যাটেকজাত খাবারের মধ্যে অধিকাংশ সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে– নাম না লিখে ই-কোডের মাধ্যমে প্রকাশ করা

---

১. লেবেলিং অর্থ লিখিত, মুদ্রিত বা গ্রাফিক্স আকারে বর্ণিত কোনো দ্রব্যের পরিচিতিমূলক বর্ণনা, যা লেবেলে সন্নিবেশিত বা সংযোজনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। দ্রষ্টব্য: 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) ৮৭ ধারাতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৯ মে, ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট।

২. 'লেবেল' অর্থ কোনো খাদ্যদ্রব্যের মোড়কের উপর সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ কোনো ট্যাগ, ব্রান্ডমার্ক, চিত্র, চিহ্ন, হলমার্ক, গ্রাফিক্স বা বর্ণনামূলক নির্দেশনা, যা লিখিত, মুদ্রিত, সিলমোহরকৃত অথবা স্টেনসিল, অ্যাম্বোশ বা অমোচনীয় কালি দ্বারা কম্পিউটারাইজড প্রিন্টিং-এর মাধ্যমে অথবা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ছাপ প্রদান করা হয় বা সংযোজন করা হয়। (সূত্র: প্রাগুক্ত)

৩. তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল–

ক. বিশ্ববিখ্যাত দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ-এর ফাতাওয়া বিভাগ।

খ. পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামি'আতুর রশীদ করাচী-এর ফাতাওয়া বিভাগ এবং 'ফিক্হুল হালাল' বিভাগ, যে বিভাগে হালাল ফুডের উপর আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ করে গবেষণা করা হয়ে থাকে।

গ. হালাল খাদ্য ও তার সার্টিফিকেশনের উপর গবেষণাধর্মী পাকিস্তান-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Halal Foundation, Pakistan

ঘ. হালাল খাদ্য গবেষণা বিষয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান SANHA (South African National Halal Authority)

হতে লাগলো। কেননা, কোড বা নম্বর সব ভাষাভাষী মানুষই বুঝতে সক্ষম ছিলো। প্রাথমিক পর্যায়ে ই-কোড নির্ধারণ করতো European Economic Community (EEC)। পরবর্তী সময়ে এর দায়িত্ব গ্রহণ করে Codex Alimentarius Commission। **কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস** অর্থ, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা কর্তৃক গঠিত কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস কমিশন কর্তৃক খাদ্য, খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক নির্ধারিত বা স্বীকৃত মান, ব্যবহারবিধি, নির্দেশনা এবং অন্যান্য সুপারিশ সম্বলিত সমন্বিত খাদ্যকোড।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক **১৫ই মার্চ ২০১৭** তারিখে 'খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা ২০১৭' শিরোনামে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের বর্ণনামতে– বাংলাদেশেও Codex Alimentarius Commission-এর 'কোড নীতি' অনুসরণ করা হয়। কাজেই প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের গায়ে ই-কোড লেখার বিষয়টি বাংলাদেশেও স্বীকৃত।

'ই-কোড' মৌলিকভাবে খাদ্য-সংযোজনদ্রব্য বোঝায়। এখন জানতে হবে যে, এই খাদ্য-সংযোজনদ্রব্যগুলোর 'উৎস' (Source) কী? কেননা, উৎসটি হালাল হলে সংশ্লিষ্ট সংযোজিত দ্রব্যও হালাল হবে আর উৎসটি হারাম হলে সংযোজিত দ্রব্যও হারাম হবে। কাজেই ই-কোডের ভিত্তিতে খাদ্যপণ্যের হালাল ও হারাম নির্ধারণের জন্য ই-কোড নির্দেশিত উপাদানের উৎস সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

ই-কোডের শ্রেণীবিভাগ

ই-কোডের খাদ্য উপকরণগুলো তিন ধরনের উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়। যথা–

১. প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত

প্রাকৃতিক উৎস যেমন: গাছ, লতা-পাতা, শস্য ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদানগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়, যা পরবর্তীকালে উপাদান-গুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাবারে ব্যবহার করা হয়।

২. রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুতকৃত

প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ই-কোড গুলো অনেক সময় ব্যয়বহুল হওয়ায় পরবর্তীকালে কিছু রাসায়নিক উপাদান থেকে গ্রহণ করা হয়। **৩. প্রাণীজ উৎস থেকে প্রাপ্ত**

প্রাণীজ উৎস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদানগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়, যা পরবর্তীতে উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাবারে ব্যবহার করা হয়।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে সকল ই-কোডের উৎস প্রাকৃতিক কোনো উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক কোনো হালাল পদার্থ, সে ই-কোডগুলো তার উৎসের ভিত্তিতে 'হালাল' নির্দেশ করবে, (যদি না তাতে মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কোনো প্রভাব, নেশা ও নাপাকী থাকে)। উদাহরণত E100। এটা মূলত হলুদ থেকে আহরিত রং-বিশেষ। খুবই স্বাভাবিক কথা যে, উদ্ভিজ উপাদান হওয়ায় হলুদের রং কখনই হারাম হবে না। কাজেই ব্যাপক অর্থে 'সকল ই-কোডই হারামের নির্দেশ করে' এ দাবী বাস্তবতার আলোকে সঠিক নয়।

উৎসের ভিত্তিতে হালাল ও হারামের নির্দেশক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত ই-কোডকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি–

১. হালাল: যে সকল ই-কোড নিশ্চিতভাবে উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক হালাল বস্তু থেকে আহরিত উপাদানের নির্দেশ করে।

২. হারাম: যে সকল ই-কোড নিশ্চিতভাবে হারাম প্রাণীজ উৎস থেকে আহরিত উপাদানের নির্দেশ করে।

৩. মাশবূহ: (যাতে হালাল-হারাম কোনটাই স্পষ্ট নয়)[১] যে সকল ই-কোডের উপদানের উৎসে দ্বি-মুখী সম্ভাবনা রয়েছে যে, তা উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক হালাল বস্তু থেকে আহরিত হতে পারে, আবার প্রাণীজ উৎস থেকেও আহরিত হতে পারে। এই ই-কোডগুলোর ব্যাপারে হারাম হওয়ার সন্দেহ এ জন্য যে, এখানে আশঙ্কা আছে যে, সংশ্লিষ্ট ই-কোডের উপাদানটি কোনো হারাম প্রাণী থেকে নেওয়া হয়েছে, অথবা হালাল কোনো প্রাণী থেকে শরয়ী জবাই ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছে। উভয় সূরতেই উক্ত উপাদানটি তার উৎসের কারণে হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু একইসাথে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, উক্ত উপাদানটি উদ্ভিদ উৎস বা রাসায়নিক উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, কাজেই নিশ্চিতভাবে এই ই-কোডগুলোকে হারাম বলা যায় না; বরং বলতে হবে যে, এই ই-কোডগুলো হালাল বা হারামের নির্দেশক হওয়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। আর খাদ্যপণ্যের মধ্যে যেহেতু শরীয়তের মূল হুকুম হল হালাল হওয়া, কাজেই সে মূল হুকুমের ভিত্তিতে মাশবূহ ই-কোড-যুক্ত খাবার খাওয়া জায়েয হবে। তথাপি যেহেতু অস্পষ্টতা আছে, এজন্য উত্তম হবে পারতপক্ষে মাশবূহ ই-কোড থেকেও বেঁচে থাকা।

প্রবন্ধের শুরুতে নীতিমালার আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রাণীর গোশ্ত ও অ্যালকোহল ব্যতীত অন্য খাদ্যপণ্য মৌলিকভাবে হালাল, যতক্ষণ না তাতে হারাম হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। 'ই-কোড' সম্বলিত প্রসেস্ড ফুড যেহেতু মৌলিকভাবে হালাল, কাজেই মাশবূহ 'ই-কোড' সম্বলিত খাদ্যপণ্যের ব্যাপারেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ ব্যাপারে ইসলামী ফিকহশাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য ফাতওয়া গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে শামী'তে ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত একটি মাসআলা আলোচনা করা আবশ্যক মনে করছি।

قال ابن عابدين : في التتارخانية: من شك في إنائه أو في ثوبه أو بدن أصابته نجاسة أو لا فهو طاهر ما لم يستيقن، وكذا الآبار والحياض والجباب الموضوعة في الطرقات ويستقي منها الصغار والكبار والمسلمون والكفار؛ وكذا ما يتخذه أهل الشرك أو الجهلة من المسلمين كالسمن والخبز والأطعمة والثياب اه ملخصا.

উল্লিখিত মাসআলার শেষে প্রাণী ব্যতীত সাধারণ খাবার যেমন রুটি ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে যে, যদিও অমুসলিম কিংবা দীনী বিষয়ে অসচেতন কোনো মুসলমান সে খাবার তৈরি করে এবং অমুসলিম হওয়ায় কিংবা অসচেতন মুসলিম হওয়ায় সেখানে এ সন্দেহ থেকে যায় যে, খাবারটি হয়তো হালাল উপায়ে তৈরি করেনি– তথাপি এ সন্দেহ ধর্তব্য হবে না; বরং তা হালাল মনে করা হবে।

এ বিষয়ে মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ.-এর একটি ফাতওয়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়– (দ্র. আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১২৮)

سوال: ڈبل روٹی پر جیلی لگا کر کھاتے ہیں اسکو ناجائز کہتے ہیں- کیونکہ یہ جانور کی کھال اور ہڈی سے بنتی ہے؟ آپکی تحقیق کیا ہے؟

---

১. ই-কোডের হুকুমের মধ্যে উল্লিখিত 'মাশবূহ' শব্দটি কোনো ফিক্‌হী পরিভাষা নয়; বরং এটি নতুন পরিভাষা, যা কুরআন-হাদীসের আলোকে বর্তমান যুগের ফিক্‌হ বিশেষজ্ঞগণ নির্ধারণ করেছেন। এর অর্থ হলো, 'এমন বিষয়, যার হালাল হওয়া কিংবা হারাম হওয়া কোনটিই স্পষ্ট নয় এবং এই অস্পষ্টতা স্থায়ী নয়; বরং গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা দূরীভূত করা সম্ভব। মাশবূহ-এর অর্থটি বোঝার সুবিধার্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি উদাহরণ (তাকরীবী মেছাল) হতে পারে 'মুশকিল'-পরিভাষাটি। আর 'মুশকিল'-এর হুকুম হলো-চিন্তা, গবেষণা এবং তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ অস্পষ্টতা দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে। অস্পষ্টতা দূর হয়ে গেলে স্পষ্ট হুকুম মতে আমল করতে হবে। (উসূলে সারাখসী; ১/১৬৮) সুতরাং 'মাশবূহ' ই-কোডের হুকুমও এমনই। অর্থাৎ গবেষণা এবং তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ অস্পষ্টতা দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে। অস্পষ্টতা দূর হয়ে গেলে সেটাকে হালাল বা হারাম-এর নির্দেশক আখ্যা দেওয়া হবে।

جواب: اولا-جیلی کا ہڈی اور کھال سے بنایا جانا ضروری نہیں، درختوں کی و غیرہ سے بھی بنائ جاتی ہے، ثانیا-اگر کھال وغیرہ سے بنائ گئ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کھال مردار ہی کا ہو، حلال ذبیحہ کی کھال غالب ہے، ثالثا-جیلی کی صنعت میں تبدیل ماہیت کا احتمال بھی ہے اس صورت میں حرام جانور کی کھال سے بنائی ہوئ جیلی بھی حلال ہے، زیادہ تجسس کرنا اور احتمالات و اوہام کی بنا پر احتراز کرنا دین میں تعمق و غلو ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے، اور بلا دلیل شرعی حرمت کا حکم لگانا دین میں زیادتی اور تحریف ہے۔

উল্লিখিত মাসআলায় 'জেলি' (যা তৎকালীন হালাল বস্তু থেকেও বানানো হতো, আবার হারাম বস্তু থেকে বানানোরও আশঙ্কা ছিলো)-এর ব্যাপারে যেহেতু হালাল হওয়ার একটি শক্তিশালী সম্ভাবনা আছে, তাই এর ভিত্তিতে হযরত রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ. উক্ত জেলি হালাল হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন।

ই-কোডের তালিকা

ই-কোডের তালিকা বেশ দীর্ঘ হওয়ায় আমরা সংক্ষিপ্তাকারে কেবল হারাম ই-কোডের তালিকা এখানে উল্লেখ করছি। হারাম ই-কোডগুলো (যা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য) নিম্নরূপ–

E120, E441, E485, E542, E630, E631, E632, E633, E634, E635, E640, E904, E920, E921, E1510, E1519

বি.দ্র. উল্লিখিত হারাম ই-কোডগুলোর মধ্য হতে কিছু ই-কোডের ব্যাপারে উৎসের ক্ষেত্রে নিজ নিজ গবেষণা অনুযায়ী কেউ কেউ 'মাশবূহ'-এর মত ব্যক্ত করেছেন। তবে সতর্কতামূলক আমরা হারাম হওয়ার মতটিকেই গ্রহণ করেছি।

ই-কোডের উল্লিখিত হুকুমের সমর্থনে বিশ্ববিখ্যাত দীনী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়াটি লক্ষণীয়–

سوال: یہ سوال پہلے پوچھے گے ایک سوال کے تعلق سے ہے کہ آیا انڈیا کی کھانے کی مصنوعات جن پر ای کوڈ ہوتا ہے اس میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے؟ یہ بہت تشویشناک معاملات ہے دار العلوم دیوبند اس معاملہ میں کیوں خاموش ہے؟ مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ مجھے اطمینان بخش جواب ملیگا۔

جواب: فقہ کا ضابطہ ہے کہ "الاصل فی الاشیاء الاباحہ" چیزوں کے اندر اباحت ہے جبتک ہمیں پوری پختگی کے ساتھ یہ معلوم نہ ہو جاے کہ حرمت کا کونسا پہلو اس میں موجود ہے تب تک کوئ حتمی راے ہم قائم نہیں کر سکتے۔ اور محض شک کی وجہ سے کسی چیز کو حرام کہہ دینا شریعت کے اصول کے خلاف ہے آپ اپنی ذاتی حد تک احتیاط برت سکتے ہیں-فتوي نمبر: ۲۱۳۹=۱۷۴۶/ب)

ই-কোডের প্রশ্নের জবাবে দারুল উলূম দেওবন্দের পক্ষ হতে উল্লিখিত জবাবে বলা হয়েছে যে, মৌলিকভাবে খাদ্যপণ্য যেহেতু হালাল, কাজেই স্বাভাবিক অবস্থায় এ মূলনীতির আলোকে খাদ্যপণ্যকে হালাল মনে করা হবে, যতক্ষণ না হারাম হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা যায়।

ই-কোডের উল্লিখিত হুকুমের সমর্থনে পাকিস্তানের বিখ্যাত দীনী বিদ্যাপীঠ জামি'আতুর রশীদ করাচীর ফাতওয়াটি লক্ষণীয়–

سوال: کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کھانے پینے کی اشیاء جو ای کوڈ کے نام سے استعمال ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے بندہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے؟

جواب: ای کوڈ اشیاء میں شامل غذائی اجزاء اور غذائی اضافات کی علامت ہے- یہ غذائی اجزاء اور غذائی اضافات نباتات اور جانوروں سے حاصل کیے جاتے ہیں- اگر یہ نباتات سے ماخوذ ہو تو شرط یہ ہے کہ یہ مضر اور نشہ آور نہ ہوں- اور اگر جانوروں سے حاصل کردہ ہو تو شرط یہ ہے کہ جانور حلال ہو نیز انہیں شرعی طریقہ سے ذبح کیا گیا ہو۔

اگر کسی مصنوع میں شرائط مذکورہ کے حامل غذائی اجزاء اور غذائی اضافات کے ای کوڈز شامل ہو تو وہ ای کوڈز حلال ہو گیورنہ حرام شمار ہو گی۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئ کہ ہر ای کوڈ مصنوع کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کے بارے میں تفصیل مذکور کے مطابق معلوم کیا جائیگا کہ وہ ای کوڈ کس غذائی جزو کی علامت ہے اور وہ غذائی جزو حلال ہے یا حرام؟ جامعة الرشيد، كراتشي، باكستان. فتوي نمبر: ٦٥٣٥٤/٥٨)

ই-কোডের প্রশ্নের জবাবে জামি'আতুর রশীদ করাচীর উল্লিখিত জবাবের সারসংক্ষেপ হল, 'ই-কোড মূলত খাদ্য উপাদান-উপকরণের নির্দেশিকা। এ খাদ্য উপাদান কখনো তো উদ্ভিদ থেকে নেওয়া হয়, আবার কখনো প্রাণী থেকে নেওয়া হয়। উদ্ভিদ থেকে নেওয়া হলে শর্ত হল, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং নেশাজাতীয় না হওয়া। আর প্রাণী থেকে নেওয়া হলে শর্ত হল, হালাল পদ্ধতিতে জবাই করা। মোটকথা, ই-কোড মানেই হারাম নয়; বরং হালাল-হারামের বিষয়টি নির্ভর করবে কোড নির্দেশিত উপাদানের উপর..।'

ই-কোডের উল্লিখিত হুকুমের সমর্থনে একই মত ব্যক্ত করেছেন হালাল খাদ্য গবেষণা বিষয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান SANHA (South African National Halal Authority এবং পাকিস্তানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Halal Foundation, Pakistan।

সাধারণ ভোক্তাদের করণীয়

আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠের পর একজন সচেতন পাঠকমাত্রই এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত হবেন যে, হালাল খাদ্য ও ই-কোডের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট করণীয় কী? এ পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে নিবেদন হল–

১. যদি খাদ্যপণ্য হালাল ই-কোড সম্বলিত হয় তাহলে সে খাদ্যপণ্যকে হালাল মনে করতে হবে এবং নির্দ্বিধায় তা ক্রয় করা এবং খাওয়া যাবে।

২. যদি হারাম ই-কোড সম্বলিত হয় তাহলে সে খাদ্যপণ্য ক্রয় করা কিংবা খাওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে।

৩. যদি মাশবূহ ই-কোড সম্বলিত হয় তাহলে সে খাদ্যপণ্যকে মৌলিকভাবে হারাম তো বলা যাবে না; তবে তাকওয়া ও পরহেজগারীর দাবী হল সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকা। কাজেই পারতপক্ষে মাশবূহ ই-কোড সম্বলিত খাদ্যপণ্য থেকে বেঁচে থাকাও উত্তম বিবেচিত হবে।

তা-সত্ত্বেও কেউ যদি তা ক্রয় করে কিংবা খায় তাহলে তা ক্রয় করা এবং খাওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া না যায়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি জীবনের সকল ক্ষেত্রে হারাম থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আ-মীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

কুকুরপ্রীতি ও ইসলাম

তানভীর মুস্তফা

প্রীতি-সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও দয়ামায়ার ধর্ম ইসলাম। যে কোন প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা ও দয়ামায়া প্রকাশের শিক্ষা ইসলামে নজিরবিহীন; তা সে কুকুর-বেড়ালই হোক না কেন। জনৈক ব্যভিচারী নারী পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করেছে। আরেক নারী বিড়ালকে কষ্ট দিয়ে শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। তাই যে কোন প্রাণীর প্রতি দয়ামায়া প্রকাশে ইসলামে দোষ নেই, বরং ইসলাম এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে এর অসংখ্য সওয়াব ও ফযীলত। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

অর্থ: সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! অবলা জীবজন্তুর মাঝেও কি আমাদের জন্য প্রতিদান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক প্রাণবিশিষ্ট জন্তুর মাঝেই প্রতিদান আছে।' (সহীহ বুখারী, হা.নং ৬০০৯) অর্থাৎ যে কোন প্রাণীর প্রতি দয়া প্রকাশে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিদান রয়েছে। তবে দয়ামায়া আর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশটাও রুচিসম্মত ও শরীয়ত-সম্মত পদ্ধতিতে হওয়া চাই। পাশ্চাত্য-সমাজে কুকুর যেভাবে জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কোনো সুস্থ ও রুচিশীল সমাজে তা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু কথা হল, মানুষ হয়ে কুকুরের সাথে মানুষের মতো সখ্যতা করা, প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা– এটা কুকুরের প্রতি দয়ামায়া নয়, বরং নিজেকে রীতিমত কুকুরের কাতারে নামিয়ে আনা কিংবা কুকুরকে নিজের কাতারে তুলে আনা– ইসলাম এর সমর্থন করে না। ইসলাম হচ্ছে স্বভাব ও প্রকৃতিজাত ধর্ম। ইসলামকে এ কারণে দীনে ফিতরাত বা স্বভাবধর্ম বলে। মানুষের স্বাভাবিক রুচি-প্রকৃতি এবং আদিম ও চিরায়ত সত্তার মধ্যে ইসলাম সুদৃঢ়ভাবে অস্তিত্ববান।

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তিন ধরনের প্রাণী সৃষ্টি করেছেন–

১. নিরীহ প্রাণী। যেমন, উট-মহিষ, গরু-ছাগল, ভেড়া-দুম্বা প্রভৃতি।

২. হিংস্র প্রাণী। যেমন, বাঘ-সিংহ, বানর-হনুমান, ভল্লুক-হায়েনা প্রভৃতি।

৩. নিরীহ ও হিংস্র স্বভাবমিশ্রিত। যেমন, কুকুর।

এই তিন প্রকার প্রাণীর ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনা। প্রথম প্রকার প্রাণীর প্রতিপালন ইসলামে অনুমোদিত। কারণ, এসব প্রাণীর স্বভাব মানবস্বভাবের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের পথে অন্তরায় নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষ উপকারীও বটে। বিনয়-নম্রতা ও সহজ-সরলতার নানা শিক্ষা এদের থেকে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার প্রাণীর প্রতিপালন ইসলামে নিষিদ্ধ। একজন মুসলমানের জন্য যদিও ইসলামের এ বিধান মানতে এর অন্তর্নিহিত কারণ কি, তা জানার প্রয়োজন নেই। তথাপি আধুনিক জ্ঞান-গবেষণা ইসলামপ্রদত্ত এ বিধানের যথার্থতা আরো বেশী স্পষ্ট করে দিয়েছে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানবদেহ ও মানবাত্মার সুস্থ-স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে সংশ্রবের বিরাট প্রভাব রয়েছে। এসব প্রাণীর সংশ্রব মানবাত্মার সুস্থ বিকাশের ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধক ও ক্ষতিকারক।

কুকুরের কথাই ধরুণ, তার মাঝে প্রচণ্ড রকম প্রভুভক্তি ও চৈতন্যের গুণ থাকা সত্ত্বেও মারাত্মক ক্ষতিকারক কিছু দোষও রয়েছে, যার একেকটি মানবস্বভাবের জন্য বিষতুল্য।

১. কুকুর চরম হিংসুটে ও স্বার্থপর প্রাণী; স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তার স্বভাবে মোটেই নেই।

২. কুকুর লোভী প্রাণী; প্রচণ্ড লোভের কারণে সর্বদা খাদ্যের তালাশে রাস্তা শুঁকেশুঁকে চলে এবং অখাদ্য-কুখাদ্য যা-ই সামনে পড়ে তাতেই মুখ দেয়।

৩. কুকুর অত্যন্ত বেহায়া ও নির্লজ্জ প্রাণী। পথঘাট ও লোকসমাগমের মাঝেও যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হতে মোটেই দ্বিধা করে না।

৪. কুকুর খুবই নোংরা প্রাণী। খাবার গ্রহণে তার বিন্দুমাত্র বাছ-বিচার নেই। নোংরা-পঁচা-দুর্গন্ধময় খাবার খেতে তার বাধে না।

এতো গেলো কুকুরের স্বভাব-চরিত্রের কথা। এছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, কুকুরের দেহে মারাত্মক ও দ্রুত বর্ধনশীল জীবাণু আছে যা স্বল্প সময়ের মধ্যে আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। কুকুর যেখানেই বসে সেখানেই কিছু জীবাণু রেখে যায়; বিশেষত কুকুরটি যদি অসুস্থ ও চর্মরোগে আক্রান্ত হয়।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কুকুরপালন এবং তার সাথে খেলাধুলা ও মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য-জীবন ও মনন-মানসিকতার উপর যে কুপ্রভাব পড়ে তা অত্যন্ত আশংকাজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ। কুকুরের দেহে থাকা জীবাণুর ফলে দুরারোগ্য ব্যাধির প্রবল আশংকা রয়েছে। কুকুরের শরীরে একধরনের জীবাণু আছে, যা মানবদেহে খোস-পাঁচড়ার মতো রোগ সৃষ্টি করে। কুকুরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক মেলামেশার ফলে খাবার ও পানীয়ের মাধ্যমে এসব জীবাণু মানুষের পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। ক্রমে পাকতন্ত্র ভেদ করে তা রক্তের রন্ধ্রে প্রবেশ করে। সেখান থেকে দেহের প্রধান অঙ্গ যেমন কলিজা, ফুসফুস, মস্তক ইত্যাদিতে প্রবেশ করে নানারকম রোগের উপসর্গ তৈরী করে। ধীরে ধীরে তা মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। কুকুর কামড়ালে মানবদেহে র‍্যাবিস, টক্সো প্লাজমোসিস ও কালাজ্বরের মতো ভয়াবহ রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। পশুচিকিৎসকগণ বলেছেন, 'কুকুরের দেহে এমন জীবাণু আছে যা মানবদেহে সংক্রমিত হলে জলাতংকের মত মারাত্মক ও দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিতে পারে।'

কুকুরের সঙ্গে অধিক মেলামেশা ও মাখামাখির কারণে যে সব দুরারোগ্য ব্যাধির ঝুঁকি তৈরী হয় তা থেকে বাঁচতে খোদ ইউরোপের চিকিৎসকগণ কুকুরের সংশ্রব থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। জার্মান চিকিৎসাবিদ নোনালার বলেন–'মানুষের রোগ-জীবাণুর শতকরা ১ ভাগ আসে কুকুর থেকে। কোনো কোনো দেশে শতকরা ১২ ভাগ। আর তা প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে, জীবাণুগুলোকে কুকুরের দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা, ছড়াতে না দেয়া।'

তিনি আরো বলেন, '... মানুষ যদি সুস্থতার সঙ্গে জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে উচিত হচ্ছে কুকুরের সঙ্গে কোনরূপ সখ্যতা না রাখা, কাছে আসতে না দেয়া, বাচ্চাদেরকে কুকুরের সঙ্গে উঠাবসা থেকে বিরত রাখা, কুকুরকে হাত চাটতে না দেয়া, বাচ্চাদের খেলাধুলার জায়গায় কুকুর আসতে না দেয়া। অথচ অবস্থা হচ্ছে, বাচ্চাদের

শোবারঘরে কুকুর পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে কুকুরের খাবারের পাত্রও আলাদা হওয়া চাই। মানুষ নিজে যে প্লেটে খায়, তা কুকুরের সামনে দিবে না। বাজার, হোটেল প্রভৃতি স্থানে কুকুর সাথে আনবে না। পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে কুকুরকে খানাপিনার বস্তু থেকে দূরে রাখবে।' করোনা ভাইরাসের কথিত সংক্রমণের সঙ্গে বন্যপ্রাণীর মাংসের সম্পর্ক থাকার কথা জানার পর চীন চলতি বছরের ১ মে থেকে বন্যপ্রাণী খাওয়া এবং বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। চীনের প্রশিদ্ধ শহর শেনজেন একধাপ এগিয়ে বন্যপ্রাণীর পাশাপাশি কুকুর ও বিড়ালের মাংস বিক্রি এবং খাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেনজেন শহর কর্তৃপক্ষ বলছে, 'কুকুর ও বিড়ালের সাথে মানুষের সম্পর্ক সবচেয়ে গভীর। তবে উন্নত দেশগুলোতে কুকুর ও বিড়াল খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে আরো আগে।' এই নিষেধাজ্ঞাকে মানবসভ্যতার অংশ বলছেন তারা। প্রাণীদের অধিকার বিষয়ক সংগঠন 'হিউম্যান সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল' চীনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সবক্ষেত্রে সীমালংঘন যেখানে সভ্যতা, সেখানে কে মানে কার কথা!

যাই হোক, এসব কারণ এবং এছাড়াও আরো বহুবিধ কারণে ইসলাম প্রয়োজনবিহীন কুকুরপালন এবং এর সাথে মানবিক সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামপূর্ব জাহেলীযুগে আরবের লোকদের মাঝে কুকুর-সংস্কৃতির ব্যাপক ছড়াছড়ি ছিলো। সফরে কি ঘরে কুকুর ছিলো তাদের নিত্যসঙ্গী। কুকুরবিহীন তাদের জীবন ছিলো অচল। যেমনটি আজকের পাশ্চাত্য জীবনধারায় দৃশ্যমান। এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমসমাজ থেকে আরবের দীর্ঘদিনের এই কুপ্রথা ও কুকুরজনিত নানাবিধ মানবিক ও সামাজিক সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে কয়েকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে গণহারে কুকুরনিধনের নির্দেশ দেন। ক্রমান্বয়ে কুকুরপ্রীতি কমে আসলে শুধুমাত্র কালো কুকুর নিধনের নির্দেশ বলবৎ রাখেন। সাথে সাথে অপ্রয়োজনে ও শখের বশে কুকুর পালনের জঘন্যতম দীনী ক্ষতির কথা উল্লেখ করেন। কুকুরের মূল্যকে নিকৃষ্ট উপার্জন বলে অভিহিত করেন। শরীয়তসমর্থিত প্রয়োজনে কুকুর পালনের অনুমতি দিলেও কুকুরের ঝুটা থেকে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করেন। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কুকুরসংক্রান্ত এসব হাদীস এখানে পেশ করা হচ্ছে–

কুকুর নিধনের নির্দেশ:

১. হযরত আয়েশা রাযি. বলেন–

واعد رسول الله ﷺ جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا، فألقاها من يده، وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله، ثم التفت، فإذا جرو كلب تحت سريره ... فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ...

অর্থ: 'হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম কোন এক সময়ে নবীজীর সাথে সাক্ষাতের ওয়াদা করেন। কিন্তু সময়মত তিনি আসলেন না। নবীজীর হাতে একটি লাঠি ছিলো, তিনি (ক্ষোভবশত) তা ফেলে দিয়ে বললেন, আল্লাহ তাঁর ওয়াদার বরখেলাফ করেন না এবং তাঁর রসূলগণও না। ইত্যবসরে হঠাৎ খাটের নিচে দেখেন একটি কুকুরছানা। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করেন, হে আয়েশা! এই কুকুর এখানে কখন এলো? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি তো জানি না। তারপর নবীজীর নির্দেশে তা বের করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিবরীল আলাইহিস সালাম আগমন করেন। নবীজী বলেন, আপনি আসবেন বলে ওয়াদা করেছেন, আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম; কিন্তু আপনি আসলেন না। হযরত জিবরীল বললেন, আপনার ঘরে থাকা কুকুরটিই আমার আসার প্রতিবন্ধক ছিলো। যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না।' আরেক বর্ণনায় ঘটনার অবশিষ্ট অংশ এভাবে এসেছে, 'পরদিন সকালেই নবীজী গণহারে সব ধরনের কুকুর নিধনের নির্দেশ দেন। এমনকি ছোট বাগানের পাহারাদার কুকুরও। তবে বড় বাগানের কুকুরের ব্যাপারে ছাড় দেন।' (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১০৪, ২১০৫)

২. 'হযরত জাবের রাযি. বলেন–

أمر نبي الله ﷺ بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: عليكم بالأسود

অর্থ: 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ধরনের কুকুর নিধনের নির্দেশ দেন। ফলে যদি গ্রাম থেকে কোন মহিলা নিজের সঙ্গে কুকুর নিয়ে আসতো সেটাও আমরা নিধন করতাম। তারপর একপর্যায়ে তিনি আমাদেরকে কুকুর নিধন করতে নিষেধ করেন এবং বলেন- এখন থেকে শুধুমাত্র কালো কুকুর নিধন করবে।' (সুনানে আবূ দাঊদ; হা.নং ২৮৪৬)

অন্য হাদীসে এর কারণ হিসেবে পাওয়া যায় যে, কালো রংয়ের কুকুর শয়তান তথা একটু বেশিই অনিষ্টকর এবং দুষ্ট প্রকৃতির। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫১০

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেন–

لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم

অর্থ: 'যদি কুকুর আল্লাহ পাকের সৃষ্ট জাতিসমূহের মধ্য থেকে একটি জাতি না হতো তাহলে আমি সব ধরনের কুকুর নিধনের নির্দেশ দিতাম। এখন থেকে তোমরা শুধু নিকষ কালো রংয়ের কুকুর নিধন করো।' (সুনানে আবূ দাঊদ হা.নং ২৮৪৫)

৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী বলেন–

خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور

অর্থ: 'পাঁচটি জন্তুর প্রত্যেকটিই অনিষ্টকর। কেউ তা নিধন করলে কোন দোষ নেই। সেগুলো হল– বিচ্ছু, কাক , চিল, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর।' (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১২০০)

কুকুরজনিত দীনী ও সামাজিক সমস্যা রোধকল্পে প্রাথমিক পর্যায়ে কুকুর নিধনের এই বিধান মূলত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাগত একটি বিষয় ছিলো-মাত্র। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে তা রহিত হয়ে যায়। এখন আর এটি ইসলামে ফরজ-ওয়াজিব কোন বিষয় নয়। কোন দেশের সরকার প্রয়োজনে কুকুরজনিত সমস্যা রোধকল্পে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। যেমন বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বহু দেশে এর নজির রয়েছে। কিন্তু একশ্রেণীর অতি মানবতাবাদী ও পশুপ্রেমী মানুষ ইসলামের এ বিধান নিয়ে নানা রকম জঘন্য মন্তব্য করে থাকে। তাদেরকে আসলে বলার কিছু নেই। চীন করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর, বেড়াল, চামচিকা মেরেছে। অস্ট্রেলিয়া পানি সংকট দূর করতে হাজার হাজার উট গুলি করে মেরেছে। কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চীন, আরাকান, সিরিয়া ও ইয়েমেনসহ পৃথিবীর বহু দেশে গণহারে মুসলিম নিধন চলছে। কিন্তু এসব নিয়ে তথাকথিত অতি মানবতাবাদী ও পশুপ্রেমীদের কোন প্রকার উচ্চবাচ্য বা হাঁকডাক শোনা যায় না।

বিগত কয়েক বছর ধরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপকহারে কুকুরের উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় গত সেপ্টেম্বরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন রাজধানী থেকে ৩০ হাজার কুকুর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই থেকে এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে উঠে পড়ে লেগেছে এসব প্রাণীপ্রেমী ও পরিবেশবাদী

সংগঠনগুলো। তারা বলছে, নিধন কিংবা স্থানান্তর নয়, বন্ধ্যাত্বকরণ কর্মসূচি জোরদারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কুকুরের সংখ্যা। নইলে শহরের পরিবেশ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে বলেও তারা উল্লেখ করে।

এদিকে ২০১৯ সালে করা প্রাণীকল্যাণ আইন বলছে, মালিকানাবিহীন কোনো প্রাণীনিধন বা স্থানান্তর দণ্ডনীয় অপরাধ। এছাড়া ২০১৪ সালে একটি প্রাণীপ্রেমী সংগঠনের রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে কুকুরনিধন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলো আদালত এবং ২০১৪ সালেই ঢাকার সিটি করপোরেশন কুকুর নিধন কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে কুকুরকে ভ্যাক্সিনেশনের আওতায় আনার কাজ শুরু করে।

একদিকে কুকুরনিধনে নিষেধাজ্ঞা, অন্যদিকে কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারী সংস্থাগুলো যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়ায় রাজধানীতে কুকুরের উপদ্রব বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। যত্রতত্র কুকুরের ঘোরাঘুরি পথচারীদের চলাচলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে চরম আকারে। কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর বিশৃঙ্খল দৌড়াদৌড়িতে ফজরের জামাআতে অংশ নেয়া ও প্রাতভ্রমণে বের হওয়া বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলগামী শিশু এবং নারীরা কুকুরের ভয়ে সদা আতংকগ্রস্ত থাকেন। কখনো কুকুরের দল পথচারীদের গতিরোধ করছে, কখনো ধাওয়া করছে, কখনো বা কামড়ে রক্তাক্ত করে ফেলছে। কুকুরের এহেন জ্বালাতন থেকে নগরবাসীকে সুরক্ষা দেয়ার দাবীতে গত ২রা সেপ্টম্বর ২০২০ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন এলাকাবাসী নগরভবনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে। তাদের দাবী, 'আইন ভেঙ্গে হলেও' বেওয়ারিশ কুকুর নিধন করুন, নগরবাসীকে কুকুরের জ্বালাতন থেকে রক্ষা করুন।'

এদিকে এ দাবীর বিপক্ষে পশুপ্রেমী ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো পাল্টা দাবী জানাচ্ছে, 'কুকুরনিধন নয়, বরং কুকুরকে ভ্যাক্সিন দিন, বন্ধ্যা করুন।' এতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আচ্ছা, যারা এ ধরনের দাবী তুলছেন, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, একটি কুকুরকে ভ্যাক্সিন দিতে ও বন্ধ্যা করতে কত খরচ হয়? কুকুরপ্রেমী এনজিও 'অভয়ারণ্য' প্রতিটি কুকুরকে ভ্যাক্সিন দিতে এবং বন্ধ্যা করতে ২০১২ সালে দাবী করেছিলো ৩ হাজার টাকা। এখন প্রশ্ন হল, সারা বাংলাদেশে কত লক্ষ কুকুর আছে? কুকুর নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থাগুলোর দেয়া তথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র ঢাকার রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়ানো কুকুরের সংখ্যা অন্তত এক লাখ। সারা বাংলাদেশে কুকুরের সংখ্যা ৩০-৪০ লক্ষের কম হবে না। ৪০ লক্ষ কুকুরের মধ্যে ধরুন অর্ধেক মাদী। তার মানে ২০ লক্ষ কুকুরকেও যদি ভ্যাক্সিন প্রয়োগ ও বন্ধ্যা করা হয়, তখন বাজেট লাগবে ৬০০ কোটি টাকা। তাছাড়া বন্ধ্যা বলতে মাদী কুকুরকে লাইগেশন করা এবং নর কুকুরকে খোজা করা বোঝায়। এটি একটি অপারেশন, যা সময়সাপেক্ষ বিষয়। একটি কুকুরকে ধরা, অতঃপর অপারেশন থিয়েটারে আনা, অতঃপর অজ্ঞান করা, অতঃপর অপারেশন করা, অতঃপর তাকে পোস্ট অপারেশন কেয়ারে নেওয়া, এগুলো করতে কত সময়ের দরকার? ধরে নিলাম, একটি কুকুরের হাসপাতাল ১২ ঘন্টায় ১২টি অপারেশন করতে পারে। তাহলে ৩৬৫ দিনে অপারেশন করতে পারে ৪৩৮০ টি কুকুর। তাহলে ১ বছরে ২০ লক্ষ কুকুরকে বন্ধ্যা করতে হলে মোট হাসপাতালের প্রয়োজন হবে ৪৫৬টি। এবার প্রশ্ন হল, বাংলাদেশে মানুষের জন্য কতগুলো হাসপাতাল আছে?

তাছাড়া কুকুর খুব দ্রুত বংশ বিস্তার করে। সাধারণত বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং একবারে ৪-৮ টা পর্যন্ত বাচ্চা দিতে পারে। তার মানে বাংলাদেশে যদি ৪০ লক্ষ কুকুর থাকে এবং ২০ লক্ষ থাকে মাদী কুকুর, তবে ১ বছর পর কুকুরের সংখ্যা দাঁড়াবে (৪০ লক্ষ + ২০ গুণ ৬ লক্ষ) = ১ কোটি ৬০ লক্ষ কুকুর। ধরে নিলাম, সরকার এ বছর ২০ টা ডেডিকেটেড হাসপাতাল বানিয়ে ১ লক্ষ কুকুর বন্ধ্যা বানাতে পারলো, তবে পরের বছর কুকুরের সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ। পার্থক্যটা খুব বেশী না। তার মানে এ বছর যদি কুকুরের জন্য বাজেট লাগে ৬০০ কোটি এবং সব কুকুরকে বন্ধ্যা করতে যদি সমর্থ না হোন (এনজিও 'অভয়ারণ্য' ঢাকা সিটিতে কুকুর বন্ধ্যা করার দায়িত্ব নিয়ে সফল হয়নি), তবে পরের বছর বাজেট লাগবে তার চারগুণ, মানে ২৪শ' কোটি টাকা। এভাবে কুকুরের সংখ্যা যতো বাড়বে চক্রবৃদ্ধি হারে তার খরচও বাড়তেই থাকবে।

এনজিওগুলো আমাদেরকে কুকুরপ্রেম শেখায় তাদের স্বার্থেই। কারণ আমরা যতো কুকুরপ্রেম দেখাবো, সরকার ততো কুকুর নিয়ে বাজেট পাশ করবে এবং এনজিওগুলো ততো কুকুর নিয়ে প্রজেক্ট পাবে। কুকুরপ্রেমীরা বলে থাকেন, 'কুকুর নিধন করলে বাস্তুসংস্থানের ক্ষতি হবে'। আমরা বলতে চাই, যারা এ ধরনের কথা বলে, তারা বাস্তুসংস্থান বলতে কী বুঝাতে চাচ্ছেন? একটি প্রকৃত বাস্তুসংস্থান হচ্ছে তার সমস্ত সদস্যদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা থাকবে। শহরের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যই কুকুর নিধন করা দরকার। কুকুর নিধন না করার কারণে কুকুরের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে এবং শহরের বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে, যার দরুণ মানুষ কুকুর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে।

পক্ষান্তরে কুকুর নিধন হচ্ছে শহরের বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য রক্ষার উপায়। যেমন ঢাকা সিটি করপোরেশন ২০০৫ সালে ২৭ হাজার ৬৯১ টি, ২০০৬ সালে ৩৭ হাজার ৫১৫ টি, ২০০৭ সালে ২০ হাজার ২৭৪ টি, ২০০৮ সালে ২২ হাজার ৪০৬ টি, ২০০৯ সালে ২৬ হাজার ২৫৬টি এবং ২০১০ সালে ২১ হাজার কুকুর নিধন করে। অর্থাৎ ৬ বছরে ঢাকা সিটি করপোরেশন কুকুর নিধন করেছে দেড় লক্ষ। দেড় লক্ষ কুকুর নিধন করার কারণে কি কুকুর শেষ হয়ে গেছে? কখনই না। বরং শহরে কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থেকেছে। কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু যখনই কুকুরপ্রেমী এনজিওদের বাধার কারণে কুকুরনিধন বন্ধ করা হয়েছে, তখন থেকেই শুরু হয়েছে সমস্যা; ঝামেলা বেঁধেছে শহরের ভারসাম্যে। যেহেতু কুকুর প্রচুর পরিমাণে প্রজনন করে, তাই কুকুর নিধন করে কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই মানববসতির বাস্তু-সংস্থানের অংশবিশেষ। কুকুরনিধনের বিরোধিতা করা মানে জনবসতির ভারসাম্যের বিরোধিতা করা।

অনেকে বলে, 'কুকুর ময়লা খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে'। অথচ করোনার সময় আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে– সবাই জীবাণু থেকে দূরে থাকবেন। বাইরে থেকে এসে কাপড় ধুবেন, গ্লাভস-মাস্ক পরবেন। সিটি করপোরেশন থেকে বাসা বাড়িতে বড় বড় পলিথিন সরবরাহ করা হল, যেন, ময়লাগুলো ঠিকমতো প্যাকড থাকে এবং গাড়ি এসে সেই প্যাকড ময়লাগুলো নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর বিপরীতে তথাকথিত পরিবেশবাদীরা কুকুর দিয়ে ময়লা কমানোর কথা চিন্তা করছেন। কতোটা অরুচিকর ও অস্বাস্থ্যকর চিন্তা এটা। কুকুর ময়লা আবর্জনাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেয়ে, রোগ-জীবাণুগুলো মুখে-পায়ে-শরীরে করে নিয়ে আসলো, এরপর আপনার শরীরের সাথে ঘষা দিলো, আপনার শরীর চেটে দিলো, আপনার বাসার আঙিনায় দাঁড়িয়ে থাকলো আর বাতাসে তার শরীরে থাকা রোগ-জীবাণু ভেসে আপনার শরীরে চলে আসলো।

অর্থাৎ বেওয়ারিশ কুকুরের মাধ্যমে ডাস্টবিনের নানান রোগ-জীবাণু সহজেই আপনার কাছে পৌঁছার একটা সুব্যবস্থা হল। সিটি করপোরেশন কর্মীরা যে পরিমাণ ময়লা প্রতিদিন সরায়, তার তুলনায় কুকুর যে পরিমাণ ময়লা খায় তা খুবই সামান্য। তা ছাড়া কুকুরের ময়লা খাওয়া খুবই অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর একটি সিস্টেম, যা সভ্যসমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই যারা কুকুরের ময়লা খাওয়ার দোহাই দিয়ে বেওয়ারিশ কুকুর রাখার পক্ষে সাফাই গায়, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের স্বাস্থ্যজ্ঞান খুবই নিম্নপর্যায়ের।

কুকুরপালনে দীনী ক্ষতি:

১. হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী বলেন–

من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية ...

অর্থ: 'গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ, শিকার ও শস্যক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণ- এই তিন প্রয়োজন ব্যতীত কেউ কুকুর পালন করলে তার নেকী থেকে প্রতিদিন এক কীরাত সাওয়াব হ্রাস পায়।' (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৩২২)

পার্থিব হিসাবে এক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। এছাড়া অপরাধের উৎস সন্ধান এবং অপরাধীকে চিহ্নিত করার জন্যও কুকুর পালন বৈধ। মূলকথা হল, ইসলাম বিনা প্রয়োজনে শুধুমাত্র শখ করে কুকুর পালনের বিরোধিতা করে; প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নয়। তবে অবশ্যই প্রয়োজনটা শরীয়ত সমর্থিত হতে হবে।

২. হযরত আবূ তালহা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী বলেন–

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

অর্থ: 'যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।' (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৩২২)

৩. হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী বলেন–

لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس.

অর্থ: 'যে কাফেলার সাথে কুকুর বা ঘন্টা থাকে (রহমতের) ফেরেশতারা তাদের সাথে থাকেন না।' (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১১৩)

নিকৃষ্ট উপার্জন কুকুরের মূল্য:

১. হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ রাযি. বলে, আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি–

شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام

অর্থ: 'সবচে' নিকৃষ্ট উপার্জন হল ব্যভিচারের বিনিময়, কুকুরের মূল্য এবং শিঙ্গা লাগানোর উপার্জন।' (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫৬৮)

এখানে শিঙ্গা লাগানোর উপার্জনের কথা বলা হয়েছে। এটা সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন মুখ লাগিয়ে রক্ত বের করা হবে। অন্যথায় ইসলামে এ পেশা হালাল। নবীজী নিজেও শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং এর মূল্য প্রদান করেছেন।

২. হযরত আবূ মাসউদ আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত–

أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن

অর্থ: 'নবীজী কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিশ্রমিক ভোগ করতে বারণ করেছেন।' (সহীহ বুখারী, হা.নং ২২৩৭)

৩. হযরত আবূ যুবায়ের বলেন–

سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك

অর্থ: 'আমি হযরত জাবের রাযি.-কে কুকুর ও বেড়ালের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবীজী এগুলো থেকে কঠোরভাবে বারণ করেছেন।' (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫৬৯)

কুকুরের ঝুটা সম্পর্কে সতর্কতা:

১. হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী বলেন–

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار

অর্থ: 'তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয় তখন সে যেনো পাত্রের সবকিছু ফেলে দেয়। তারপর পাত্রটি সাত বার ধুয়ে নেয়।' (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৭৯)

২. হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকেই তাঁর শাগরেদ মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের সূত্রে এভাবে এসেছে, নবীজী বলেন–

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب

অর্থ: 'তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয় তখন তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল, পাত্রটি সাতবার ধৌত করা এবং প্রথম বার মাটি দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করা।' (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৭৯)

অন্যান্য বর্ণনায় প্রথম বার নির্দিষ্ট না করে আগে-পরে যে কোন একবার অন্তত মাটি দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করার কথা রয়েছে।

চামড়ার চোখ নয়, বিবেকের চোখ দিয়ে একটু তাকিয়ে দেখি পাশ্চাত্য সমাজের দিকে। কুকুরপ্রীতি বরং কুকুর-সভ্যতা তাদের কোথায় নামিয়ে এনেছে। পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব সমাজে সন্তান ও পরিবারপ্রথা আজ বিলুপ্তপ্রায়। তারা সন্তানের স্থানে কুকুরকে কোলে নিচ্ছে, চুমো খাচ্ছে, কুকুরের সাথে সেলফি তুলছে, বিছানায় একসঙ্গে খেলা করছে, ঘুমোচ্ছে, একই প্লেটে একই চামচে খাবার খাচ্ছে, এমনকি মৃত্যুর পূর্বে কুকুরের নামে সম্পত্তি উইল করে যাচ্ছে। একটি কুকুরের প্রতি তারা যতোটা উদার, নিঃস্ব-অসহায় একজন মানুষের প্রতিও ততোটা উদার নয়।

বিবিসি বাংলার খবরে প্রকাশ, ব্রিটিশ এক দম্পতি মাত্র ১০ দিনের জন্য ভারতের কেরালায় বেড়াতে এসে কুকুরের মায়ায় পড়ে আর স্বদেশে ফিরে যাননি। সেখানকার একদল কুকুরের পেছনে তারা খরচ করেছেন তাদের নিজেদের জমানো তিনলাখ পাউন্ড (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৩ কোটি ২৭ লাখ টাকা)। কুকুরের সুচিকিৎসার জন্য তারা একটি হাসপাতাল তৈরী করেছেন। বেওয়ারিশ কুকুর দেখভাল করার জন্য একটি সংস্থাও গড়ে তুলেছেন, যাদের কাজ রাস্তা থেকে অসুস্থ কুকুর তুলে এনে তাদেরকে খাওয়ানো, টিকা দেয়া ইত্যাদি।

ভারতে বর কুকুর পছন্দ করে না বলে ভেঙ্গে গেছে বহু বিবাহ। ইউরোপ-আমেরিকায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে কুকুরপ্রেমী তরুণীর সংখ্যা। কোন কোন তরুণী তো রীতিমত ...। আল্লাহ মাফ করুন, চিন্তা-চেতনা ও স্বভাব-প্রকৃতিতে পচন ধরলে যা হয়।

আফসোস! একদিকে পৃথিবীর লক্ষ-কোটি বনী আদম ভূখা-নাঙ্গা মরছে, অপরদিকে কুকুরের পেছনে মিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার অপচয় হচ্ছে। একদিকে পৃথিবীর হাজার হাজার শিশু-নারী সুচিকিৎসার অভাবে প্রাণ হারাচ্ছে, অপরদিকে কুকুরের আয়েশের জন্য কতো আয়োজন। আহ! পশ্চিমা অভিধানে এই বুঝি সভ্যতা! এই বুঝি মানবতা!

আজকাল আমাদের দেশের একশ্রেণীর তথাকথিত মানবতাবাদী, প্রগতিবাদী, সভ্যসমাজ(?), পাশ্চাত্যের জাহেলী সংস্কৃতি আমদানীতে যারা সদাতৎপর, কুকুর-সংস্কৃতিতেও ব্যতিক্রমের পরিচয় দিচ্ছে না। রাস্তাঘাট, হোটেল-শপিংমল এবং বিভিন্ন পার্কে কুকুর সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরি তাদের খুবই পছন্দ। এতে তারা খুবই গর্ববোধ করে। শখ করে কুকুর পোষা, মানুষের চেয়ে কুকুরের যত্ন বেশী নেয়া, কুকুরের সঙ্গে মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন করা এসবই তাদের নিকট প্রগতি ও উদার সংস্কৃতির পরিচায়ক। জানি না এতে বাঙালী সংস্কৃতির মোড়ক লাগতে আর কতদিন লাগবে। তবে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের উপমা দিতে গিয়ে মিশরের মুসলিম গবেষক সাইয়েদ কুতুব যথার্থই বলেছেন, 'যদি আজ ওদের কেউ পায়ের জুতো মাথায় নিয়ে রাস্তায় ঘুরে, পরদিন আমাদের একদলও তাই করবে।'

লেখক পরিচিতি: শিক্ষার্থী, উলূমুল হাদীস, ২য় বর্ষ; জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

হাসান আল-বান্না
ঢাকা

৩৮১ প্রশ্ন : আমি একজন ফার্মাসিস্ট। বর্তমানে একটা ফার্মাসিউটিক্যালস-এর মার্কেটিং বিভাগে চাকুরীরত। আমরা যারা ফার্মাসিস্ট হিসেবে আছি, তাদের চাকুরীর ক্ষেত্র মূলত ফার্মাসিউটিক্যালস প্লান্ট অথবা মার্কেটিং বিভাগ। যেহেতু আমি কথা বলতে আর স্বধীনভাবে কাজ করতে পছন্দ করি, তাই মার্কেটিং-এ কাজ করার প্ল্যান করি এবং জয়েন করি। ফার্মাসিউটিক্যালস মূলত তিনটি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। ঔষধ উৎপাদন, বিপণন, বিতরণ। এগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ–

১. প্রোডাকশন: এই ডিপার্টমেন্টের কাজ হল, প্লান্টে কাজ করে ঔষধ উৎপাদন করা।

২. মার্কেটিং: নতুন ঔষধের মার্কেটিং যাচাই করা এবং মার্কেটে লঞ্চ করা। ঔষধ বিক্রির জন্য বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে দেয়া। যেমন: কোন্ ঔষধের কথা কোন্ ডাক্তারের নিকট বলতে হবে ইত্যাদি। ডাক্তারদের জন্য গিফট (মোবাইল, ফ্রিজ, সোফাসেটসহ প্রায় সব ধরনের জিনিস) সিলেক্ট করে দেয়া। ডাক্তারদেরকে মাসিক বা বার্ষিক ওনারিয়াম (টাকা) দেয়া। তাদেরকে বিদেশে বিভিন্ন কনফারেন্সে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। বিনিময়ে উক্ত ডাক্তারকে কোম্পানীর নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট লিখে দিতে হবে।

মেডিক্যাল সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট: এই টিম বড় ফার্মাকোম্পানী ছাড়া কেউ আলাদা করে গঠন করে না। কিন্তু টপ ১০-১২টা কোম্পানীতে আছে। এরাও ঔষধের প্রচার এবং কোম্পানীর প্রসারের জন্য মার্কেটিং টিমের সঙ্গে একযোগে কাজ করে। এদের কাজগুলো হল–

- সায়েন্টিফিক সেমিনারের আয়োজন করা। সেখানে তারা নতুন অথবা কার্যকরী ঔষধের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে।
- ডাক্তারদের বিভিন্ন কনফারেন্সে অথবা বিভিন্ন সোসাইটির কার্যক্রমে সরাসরি (স্টল দিয়ে) অংশগ্রহণ করা।
- ইন্টার্নি (পাশ করে সদ্য বের হওয়া) ডাক্তারদের জন্য বিভিন্ন রিসিপশন প্রোগ্রাম করে দেয়া। ক্ষেত্রবিশেষে নাচ/গানের (কনসার্ট) আয়োজন করা।
- ডাক্তারদের জন্য বিভিন্ন মেডিক্যাল নিউজলেটার, আর্টিকেল, বই বা তাদের পড়াশোনায় কাজে লাগে এমন জিনিস প্রদান করা।
- ডাক্তারদের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় (কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, সিলেট ইত্যাদির বড় বড় হোটেলে) পিকনিক অথবা আউটিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা।
- ডাক্তারদের জন্য তাদের সেমিনার অথবা কনফারেন্সে গিফট করার জন্য বিভিন্ন গিফট আইটেম যেমন: ব্যাগ, প্যাড, কলম, মগ ইত্যাদি প্রস্তুত করে দেয়া।
- এ ছাড়া সেলস টিমকে মাঝে মাঝে ট্রেইনিং দেয়া এবং তাদের নিয়ে মাসিক ঘরোয়া মিটিং করা।

৩. সেলস ডিপার্টমেন্ট (মেডিক্যাল প্রোমোশন অফিসার): এরা ভ্যারাইটিস কাজ করে থাকে। যেমন–

প্রথমত তারা ডাক্তারদের নিকট ঔষধের প্রচার করে। নতুন নতুন ঔষধ এবং তার ব্যবহার (কোন রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে) অবগত করে।

ডাক্তাদেরকে তাদের ঔষধ লিখার জন্য অনুরোধ জানায়। তারা তাদের নিজস্ব কোম্পানীর ঔষধ কেনো ভালো এবং কেন ডাক্তারগণ রোগীদেরকে তাদের ঔষধ লিখবেন সেসব বলে বলে ইমপ্রেস করে প্রেসক্রিপশন করতে অনুরোধ করেন।

ডাক্তারদেরকে বিভিন্ন ঔষধের স্যাম্পল দিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে ছোটখাট গিফটও প্রদান করেন। যেমন: প্যাড, কলম ইত্যাদি।

আজকাল ডাক্তারের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমন নতুন নতুন ঔষধ কোম্পানীর সংখ্যাও বাড়ছে। এতে করে এই মার্কেটে অসুস্থ প্রতিযেগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডাক্তারদেরকে আজকাল আর ঔষধের স্যাম্পল ও ছোটখাট গিফট দিয়ে তুষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। তারা আরো বেশি কিছু চাচ্ছেন। এদিকে কোম্পানীগুলো নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য ডাক্তাররা যা চাচ্ছেন, তা-ই দিয়ে যাচ্ছে। কারণ এই কোম্পানী না দিলে ঐ কোম্পানী দিবে। ফলে এই কোম্পানী মার্কেট হারাবে। কোম্পানী কর্তৃক ডাক্তারদেরকে যেসব জিনিস দেয়া হয় তার একটি ছোট্ট তালিকা দেয়া হল–

- এই অফিসারেরা ডাক্তারদের বাজার করা, ছেলে-মেয়ে স্কুলে আনা-নেয়া, ব্যাংকে টাকা জমা, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল প্রদান করাসহ সব কাজ করে দিয়ে থাকেন। আর এটা তারা ভালো লাগা থেকে করেন তা নয়, শুধু আমার ঔষধ লিখে দিবে সেজন্য।
- ডাক্তারদেরকে বিভিন্ন দামী দামী গিফট দেয়া হয়। যেমন: মোবাইল, ফ্রিজ, টিভি, ওভেন, কম্বল, সোফাসেট, ডিনার সেট ইত্যাদি। বিনিময়ে অমুক ঔষধ এতো দিন লিখে দিতে হবে।
- ঈদ, পূজা, পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে শাড়ি, পাঞ্জাবী, নগদ টাকা, গিফট ভাউচার (টাকার) ইত্যাদি প্রদান করা হয়। বিনিময়ে নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট লিখে দিতে হবে।
- কোন এক বা একাধিক নির্দিষ্ট ঔষধ লিখে দেয়ার জন্য মাসিক বা বার্ষিক ওনারিয়াম (টাকা) দেয়া হয়। এটা ডাক্তারদের পটেনশিয়ালিটি অর্থাৎ দৈনিক তিনি কতগুলো রোগী দেখেন, সেই বিবেচনায় ৫ হাজার থেকে শুরু করে ৫ লক্ষ পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট লিখে দেয়ার শর্তে ডাক্তারদের বিভিন্ন গিফট ভাউচার যেমন- সরকারী বন্ড (লাখ টাকার) দেয়া হয়। অনুরূপভাবে ডাক্তারদের ফ্যামিলি, তাদের বিভিন্ন সোসাইটি বা কোন মেডিকেলের পুরো ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া হয়। এই প্রোগ্রাম ১ লাখ থেকে ৪০-৫০ লাখ টাকারও হতে পারে।
- এছাড়াও ডাক্তারদেরকে ইমপ্রেস করার জন্য আরো অনেক ধরনের কাজ করা হয়। যেমন: কোন ইউনিটে এসি লাগিয়ে দেয়া, দামী যন্ত্রপাতি কিনে দেয়া, চেম্বার সাজিয়ে দেয়া ইত্যাদি।
- তেমনি কিছু কিছু ঔষধের দোকানেও টাকা-পয়সা, গিফট ইত্যাদি দিয়ে ঔষধ বেচতে হয়। তবে এক্ষেত্রে ডাক্তারদের তুলনায় সামান্য টাকা আর সস্তা গিফট যেমন: চাল-ডাল, তেল-সাবান ইত্যাদি দিয়েই কাজ সারা যায়।

এই দীর্ঘ বিবরণের পর আমার প্রশ্ন হল–
(ক) ঔষধ কোম্পানীগুলোর উল্লিখিত কার্যক্রম অনেকটা ব্যাংকেরই মত কিনা, যেখানে সুদের আদান প্রদান হয় এবং এদের প্রদত্ত গিফট, টাকা ইত্যাদি কি ঘুষের পর্যায়ে পড়বে?
(খ) ঔষধ কোম্পানীগুলো মার্কেটিং এবং সেলস ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় ডাক্তারদেরকে কোম্পানীর ঔষধ লিখে দেয়ার শর্তে এই যে এতো এতো গিফট, টাকা, পিকনিক ইত্যাদির আয়োজন করে চলছে, এতে আমরা যারা এসব ডিপার্টমেন্টে কাজ করছি, তাদের বেতনের টাকা কি হালাল হবে?
হালাল হলে তো ভালো, কিন্তু যদি হারাম হয়, তাহলে কী কী কারণে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো। অনুরূপভাবে হারাম হলে আমরা হালাল মার্কেটিং কিভাবে করতে পারি সেটাও বলে দিলে বাধিত হবো। আল্লাহ চাহে তো এর দ্বারা উম্মতের বড় ফায়দা হবে, ইনশাআল্লাহ।
উত্তর : (ক) নির্দিষ্ট কোম্পানীর ঔষধ লিখে দেয়ার শর্তে ঔষধ কোম্পানীর পক্ষ থেকে ডাক্তারদেরকে যেসব দামী দামী গৃহ-সজ্জাসামগ্রী, নগদ টাকা, গিফট ভাউচার, চেম্বারের ডেকোরেশন খরচ, ভ্রমণ ও ভ্রমণের টিকিট ইত্যাদি দেয়া হয়, এগুলোকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে কোম্পানীর প্রচার বা হাদিয়া বলা হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো হাদিয়া নয়; বরং তা ঘুষের নামান্তর।
কেননা, রোগীর কাছ থেকে ফি নেয়ার পর সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের জন্য রোগীর রোগ নির্ণয় ও ভাল ঔষধের পরামর্শ দেয়া নৈতিক ও আবশ্যক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের বিনিময় হিসাবেই তিনি ফি নিয়ে থাকেন। সুতরাং উক্ত কাজের বিনিময়ে ঔষধ কোম্পানী থেকে আর্থিক সুবিধা ভোগ করা ঘুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। কাজেই ডাক্তারের জন্য রোগ নির্ণয়ের স্বার্থে ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে কমিশন নেয়া যেমন বৈধ নয়, তেমনি ঔষধ কোম্পানী থেকেও আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা জায়েয নয়।
তবে নতুন ঔষধ বাজারজাত করণের স্বার্থে বৈধ উপায়ে প্রচারণা চালানোর জন্য ঔষধের গুণগত মান কিংবা মান নির্ণয়কারী সংস্থার সত্যায়ন সংবলিত লিফলেট, ক্যালেন্ডার, প্যাড-কলমসহ প্রত্যেক এমন জিনিস যেগুলো দ্বারা ঔষধের গুণগত মান সম্পর্কে অবগতি ও প্রচারের কাজ নেয়া যায় এবং সেগুলোকে ডাক্তারের আর্থিক ফায়দা কিংবা সামাজিকভাবে মূল্যবান উপহার হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, এমন বস্তু ডাক্তারদেরকে বা ফার্মাসিস্টদেরকে ঔষধের মান সম্পর্কে অবগতির স্বার্থে কিংবা প্রচারের নিমিত্তে দিতে কোন অসুবিধা নেই এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের তা গ্রহণ করতেও কোন অসুবিধা নেই। তেমনিভাবে ঔষধের গুণাগুণ সম্পর্কে ঔষধ কোম্পানী হতে কোন সেমিনারের আয়োজন করে সেখানে ডাক্তারদেরকে দাওয়াত করা এবং অনুষ্ঠানের সাথে উপস্থিত আপ্যায়নের ব্যবস্থা করারও অবকাশ থাকবে। অনুরূপভাবে তাদেরকে এই সেমিনারে অংশগ্রহণের বাস্তব যাতায়াত খরচও দেয়া যেতে পারে।
এছাড়া অন্য কোন আর্থিক লেন-দেন, বিনোদন বা ভ্রমণের ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে ঘুষ দেয়া বলে বিবেচিত হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৯৭৯, বাদায়িউস সানায়ে ৯/৭, ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ৬/৫৬, ফাতাওয়া শামী ৫/৩৭৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩/৩৩০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/৪৪৩)
(খ) যেহেতু আপনার চাকুরীর মূল কাজ অর্থাৎ 'নতুন ঔষধের বাজার যাচাই করা এবং বাজারজাত করা' মূলত হালাল কাজ এবং আপনার গৃহীত বেতন হালাল মাল থেকে প্রদত্ত, সেহেতু আপনার চাকুরীর টাকা হালাল হবে।
তবে আপনার কাজের এই অংশ অর্থাৎ 'ঔষধ বিক্রির জন্য বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে দেয়া। যেমন, কোম্পানির কোন ঔষধ সম্পর্কে কোন ডাক্তারের নিকট বলা এবং নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট লিখে দেয়ার শর্তে গিফট (মোবাইল, ফ্রিজ, সোফাসেট, প্রায় সব ধরনের জিনিস) সিলেক্ট করে দেয়া, মাসিক বা বার্ষিক ওনারিয়াম দেয়া, বিদেশে বিভিন্ন কনফারেন্সে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি' ঘুষের লেনদেনে সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। এটা ঘুষ আদান-প্রদান করার মতই গুনাহের কারণ। কাজেই আপনাদের পক্ষে হালাল মার্কেটিং সম্ভব না হলে আপনার জন্য রিযিকের উদ্দেশ্যে ভিন্ন কোন হালাল চাকুরীর অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ভিন্ন কোন হালাল চাকুরী পেলে এই চাকুরীতে বহাল থাকা জায়েয হবে না।
হালাল মার্কেটিং করার জন্য করণীয় হল–
প্রথমত: ডাক্তারদেরকে কোম্পানীর পক্ষ থেকে কোন ঔষধ লিখে দেয়ার শর্তে বর্ণিত গিফট, ওনারিয়াম ইত্যাদি প্রদান বর্জন করা।
দ্বিতীয়ত: কোম্পানী যদি নিতান্তই এমন পরিস্থিতির শিকার হয় যে, ডাক্তার সাহেবরা বর্ণিত বিনিময় গ্রহণ ব্যতীত কোম্পানীর যে ঔষধগুলো রোগীর জন্য উপযুক্ত সেগুলোও লেখে না, তাহলে তখন জরুরতের খাতিরে পরিমিত গিফটের ব্যবস্থা করতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রদানকারীর কোন গুনাহ হবে না। তবে গ্রহণকারী সর্বাবস্থায় গুনাহগার হবে।
তৃতীয়ত: কোম্পানীর যে সব ঔষধ রোগীদের জন্য উপযুক্ত নয়, সেসব ঔষধের কোনটি লিখে দেয়ার শর্তে ডাক্তারদেরকে যে কোন ধরনের গিফট প্রদান থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। এ জাতীয় কোন ঔষধ লিখে দেয়ার শর্তে কোন ধরনের গিফট প্রদান করা কিছুতেই জায়েয হবে না; বরং তা হারাম হবে। এতে দাতা, গ্রহীতা উভয়ই গুনাহগার হবে এবং উক্ত লেনদেনের সহযোগিতায় যারা জড়িত থাকবে তারাও গুনাহের মধ্যে শামিল হবে। (আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর; পৃষ্ঠা ৯৫, ২৫০, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৫/৩১৬, ফাতাওয়া শামী ৫/৩৬২, ৬/৪২৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৯৭, ফাতাওয়া বায়্যিনাত ৪/২৪৫)

আবু উসামা
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৩৮২ প্রশ্ন : শিং মাছের দুই পাশে যে দু'টি শিরা (রগ) থাকে তার বিধান কী? খাওয়া যাবে, নাকি ফেলে দিতে হবে?
উত্তর : হালাল প্রাণীর অঙ্গ-প্রতঙ্গ খাওয়া জায়েয হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য হালাল প্রাণীর সঙ্গে মাছের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য হালাল প্রাণীর সাতটি অঙ্গ (নর ও মাদী পশুর গুপ্তাঙ্গ, অণ্ডকোষ, প্রবাহিত রক্ত, গোশ্তগ্রন্থি, পিত্ত ও মুত্রাশয়) বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অঙ্গ ও গোশ্ত খাওয়া যাবে। আর মাছের ক্ষেত্রে বিধান হল, মাছ বড় হলে পিত্তসহ পেটের ময়লা বের করে ভালোভাবে ধুয়ে অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রতঙ্গ খাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে যেসব মাছ এতোটাই ছোট ও ক্ষুদ্র যে, সেগুলোর পেট ফেঁড়ে পেটের ময়লা বের করা অসম্ভব, সেসব মাছ পুরোটাই খাওয়া যাবে। সে হিসেবে শিং মাছের দুই পাশে যে দু'টি শিরা বা রগ রয়েছে তা হালাল অঙ্গ। কেননা এই রগ দুটো পেটের ভেতরের ময়লা নয়। সুতরাং তা খাওয়া বৈধ হবে। (আল-মুগনী লি-ইবনি কুদামা ১১/৪৩, ফাতাওয়া শামী ১/৩২২, ৬/৩০৯, ৭৪৯, ইমদাদুল আহকাম ৪/৩৬০, ৩৬২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/১৪৬, আযীযুল ফাতাওয়া; পৃষ্ঠা ৭৫৯, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ২৪/১৫৭)

কামারুদ্দীন ইলিয়াস (তারেক)
ঢাকা

৩৮৩ প্রশ্ন : (ক) আমার পিতা যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কোন প্রতিষ্ঠানে দান করার ওসিয়ত করেন, তাঁর ইন্তেকালের পরে তার ওয়ারিশগণ কি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সমপরিমাণ টাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নতুনভাবে বণ্টন করতে পারবে?

(খ) আমার পিতা গত ২৭ এপ্রিল ২০১৯ ঈসায়ী তারিখে ইন্তেকাল করেন। তিনি ইন্তেকালের আগে যে পরিমাণ টাকা দান করার ওসিয়ত করে গিয়েছেন তা এই জানুয়ারীতে (২০২০) যাকাতযোগ্য হয়। যেহেতু তিনি যে টাকা দানের নিয়ত করেছেন, ইন্তেকালের পূর্বে তা মাত্র তিন মাস তার হাতে ছিল এবং পরবর্তীকালে আমাদের হাতে সেটা এসেছে গত মে মাসে। অর্থাৎ এখনও এক বছর অতিক্রান্ত হয়নি। সুতরাং এখন কি দানের এই টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে?

উত্তর : (ক) কোন ব্যক্তি কোন বৈধ ক্ষেত্রে দান করার ওসিয়ত করলে ওয়ারিসদের জন্য তার রেখে যাওয়া মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হতে তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এ ওসিয়ত পূর্ণ না করলে তারা গুনাহগার হবে।

সুতরাং আপনার পিতার ওসিয়তকৃত টাকার পরিমাণ যদি মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা তার কম হয় এবং তিনি যে প্রতিষ্ঠানে দেয়ার ওসিয়ত করেছেন তা যদি বৈধ প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে সেখানে দেয়া আপনাদের জন্য আবশ্যক। এক-তৃতীয়াংশের বেশী হলে বর্ধিত অংশটুকুর ওসিয়ত কার্যকর করা ওয়ারিসগণের জন্য আবশ্যক নয়। বরং তার বালেগ ওয়ারিসগণ নিজ অংশ বা নিজ সম্পদ হতে স্বেচ্ছায় বাড়তি অংশটুকু দিতেও পারে নাও দিতে পারে। (ফাতাওয়া শামী ৪/৩৪৩, ৪৩৩, ৬/৬৯০, ৯৬১, আল-বাহরুর রায়িক ৮/৫১৯, কিফায়াতুল মুফতী ১৩/২৯১)

(খ) যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদের উপর পূর্ণ এক চান্দ্রবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে ওসিয়তকৃত দানের টাকার উপর যেহেতু আপনার পিতার কিংবা আপনাদের কারো মালিকানাতেই বছর অতিক্রান্ত হয়নি। কাজেই তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। সুতরাং বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আপনারা ওসিয়ত পূর্ণ করতে চেষ্টা করুন। (ফাতাওয়া শামী ২/২৫৯, আল-বাহরুর রায়িক ২/২১৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/২৯)

হাফেয মাওলানা সালাহুদ্দীন
ইমাম ও খতীব, সুবর্ণ জামে মসজিদ, চন্দ্রা ত্রি মোড়, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

৩৮৪ প্রশ্ন : বাংলাদেশ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে মালিকানার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক পদ্ধতিতে যৌথ মালিকানা অর্জনের নিমিত্তে মূলধন যোগান দিয়ে মূলধন বিনিয়োগ করে কোন সম্পদ অর্জন করা উদাহরণত বহুতল ভবন নির্মাণ করা শরীয়ত-সম্মত কিনা?

অর্থাৎ দু'টি পক্ষ সম অথবা অসম অনুপাতে মূলধন যোগান দিয়ে কোন সম্পত্তির মালিকানা অর্জনপূর্বক পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ভাড়া ও বিক্রয়-মূল্য নির্ধারণ করে নির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে একপক্ষের অংশ অন্যপক্ষের নিকট ভাড়াসহ বিক্রয় করে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথ মালিক হলেও ধীরে ধীরে গ্রাহকের মালিকানা বাড়তে থাকে এবং ব্যাংকের মালিকানা ও ভাড়ার পরিমাণ কমতে থাকে। একসময় গ্রাহক সম্পদের পুরো মালিক হয়ে যায়, তখন ব্যাংক আর কোন ভাড়া পায় না। প্রকৃতপক্ষে এটা শিরকাত, ইজারা ও বাই এই তিনটি প্রক্রিয়ার সমন্বিত রূপ।

এ ধরনের সম্পত্তি থেকে অর্জিত আয় উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হয় এবং লোকসান হলে তারা মূলধন অনুপাতে বহন করে। উল্লিখিত পদ্ধতিতে কোন সম্পদ করা (বহুতল ভবন নির্মাণ করা) শরীয়ত-সম্মত কি না? বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

উত্তর : প্রশ্নে হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (HPSM) বা আল ইজারা বিল বাই তাহ্‌তা শিরকাতিল মিল্‌ক-এর শিরোনামের ব্যাখ্যায় যে পদ্ধতিটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা মূলত হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌কের সূরত নয়, বরং এটা ক্রমহ্রাসমান মালিকানা বা অংশীদারিত্ব (Decreasing Partnership/ شركة متناقصة) এর সূরত।

যার সারকথা হল, বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক (Client) অর্থাৎ গৃহ নির্মাণে ইচ্ছুক ব্যক্তি যৌথ পুঁজি দ্বারা গৃহ ক্রয় বা নির্মাণ করবে। উভয়ের নিজ নিজ পুঁজি অনুপাতে গৃহের শরীকি মালিকানা (شركة ملك) হবে। যেমন ২৫% মূলধন গ্রাহকের এবং ৭৫% প্রতিষ্ঠানের হলে গৃহ উভয়ের মাঝে চার অংশে যৌথ হবে। এক-চতুর্থাংশ হবে গ্রাহকের এবং তিন-চতুর্থাংশ প্রতিষ্ঠানের। গৃহ নির্মাণ হয়ে যাওয়ার পর গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের অংশে ভাড়াটে হিসেবে থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া পরিশোধ করবে। সে সাথে বিভিন্ন দফায় প্রতিষ্ঠানের অংশ অল্প অল্প করে ক্রয়ও করতে থাকবে। এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের অংশকে কয়েকটি ইউনিট বানানো যেতে পারে– যেমন প্রতিষ্ঠানের অংশ দশ ইউনিটে ক্রয় করা হবে। ক্রয় করার ফলে প্রতিষ্ঠানের যে অংশ কমতে থাকবে সে অনুপাতে ভাড়াও কমতে থাকবে। যখন গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের সকল অংশ ক্রয় করে নিবে তখন প্রতিষ্ঠানের মালিকানা শেষ হয়ে গ্রাহক পুরো বাড়ির মালিক হয়ে যাবে। এর পর থেকে তাকে আর ভাড়া দিতে হবে না। ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এখানে তিনটি চুক্তি (عقد) হয়েছে।

১. যৌথ মালিকানা চুক্তি (عقد شركة الملك)।
২. ভাড়া চুক্তি (عقد الإجارة)।
৩. বিক্রয় চুক্তি (عقد البيع)।

(ক) এ তিনটি চুক্তি কোনো ধরনের পূর্বশর্ত ব্যতীত পৃথক পৃথক হলে জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই।

(খ) কিন্তু কার্যত এখানে এক চুক্তির ভেতরেই তিনটি চুক্তি একটি অপরটির সাথে শর্তযুক্ত বা শর্তযুক্তের মতো হয়ে থাকে। এ অবস্থাটি ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিবেচ্য বিষয়।

এখানে এটাও বোঝার বিষয় যে, এক চুক্তিতে অন্য চুক্তির শর্তারোপ করা তখনি না-জায়েয যখন একটি চুক্তি সম্পাদনের সময়ই অন্য চুক্তিটি সম্পাদনের শর্তারোপ করা হয়।

(গ) কিন্তু অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, একসাথে কয়েকটি চুক্তির অঙ্গীকার এমনভাবে করা হয় যে, তাৎক্ষণিক কোনো চুক্তি সম্পাদন করা হয় না, বরং চুক্তিগুলো স্ব-স্ব স্থানে স্ব-স্ব সময়ে সম্পাদিত হবে। অতঃপর অঙ্গীকারকৃত বিষয়গুলোর কোনোটিকে বাস্তবে চুক্তি হিসেবে রূপ দেয়ার সময় অন্য চুক্তির কোনো শর্তারোপ করা হবে না, তাহলে এ অবস্থাকে শরীয়তে নিষিদ্ধ যৌগিক চুক্তি (صفقة في صفقة) অথবা শর্তযুক্ত বিক্রি (بيع وشرط) বলা যায় না।

শর্তারোপ ও অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য হল, চুক্তি সম্পাদনের সময়ই অন্য চুক্তির শর্তারোপ করলে উভয় চুক্তির বাস্তবায়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়। অর্থাৎ যদি দ্বিতীয় আকদ হয় তাহলে বিক্রয় সম্পাদন হবে, নইলে সম্পাদন হবে না। আর বিক্রয় এমন চুক্তি যা সংযুক্তি গ্রহণ করে না, এতে বিক্রয় চুক্তি কখনো

ফাসিদ হয়ে যায়, আবার কখনো বাতিল হয়ে যায়। তবে পৃথকভাবে অঙ্গীকার করা হলে তা বিক্রয়ের সাথে সংযুক্ত হয় না। ফলে তখন বিক্রয় চুক্তিতে কোন সমস্যা হয় না।

অতএব, 'ক' ও 'গ' ধারায় বর্ণিত ক্রমহ্রাসমান অংশীদারিত্ব (Decreasing Partnership/شركة متناقصة)-এর সূরত বৈধ ও শরীয়তসম্মত। আর 'খ' ধারায় বর্ণিত সূরত শরীয়তসম্মত নয়। সুতরাং আপনি উল্লিখিত আকদের মাধ্যমে কোন সম্পদ (বহুতল ভবন নির্মাণ) করতে চান তাহলে 'ক' অথবা 'গ' ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৩৭৮৩, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৫০৪, আল-মুগনী ৫/৪০৯, ফাতাওয়া শামী ৪/৩০০, বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসারাহ ১/২৩৯, ২৪১, ২৪৪-২৪৫, ২৪৭-২৪৮, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৫৬-৫৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/১২৩-১২৪, গাইরে সূদী ব্যাংকারী; পৃষ্ঠা ২৭৬)

মুহাম্মাদ এনায়েত
সাতমসজিদ হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩৮৫ প্রশ্ন : (ক) ফ্লোর বা মেঝে থেকে বাচ্চাদের পেশাব পবিত্র করার উপায় কী?
(খ) ফরয গোসল থেকে পবিত্রতা অর্জন পদ্ধতি কী?
(গ) দাঁত থেকে রক্ত বের হলে উযূর বিধান কী?

বিস্তারিত বিবরণ : (ক) বাচ্চাদের পেশাবের ক্ষেত্রে আমি যেটা করে থাকি সেটা হল, প্রথমে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে পেশাব মুছে ফেলি। তারপর ঐ কাপড় তিনবার ধৌত করে যে স্থানে পেশাব লেগেছে ঐ স্থানটি একবার মুছে ফেলি। এরপর ঐ কাপড় একবার ধৌত করে দ্বিতীয়বার নির্দিষ্ট স্থান মুছে ফেলি। এভাবে উক্ত কাপড় আর একবার ধৌত করে নির্দিষ্ট স্থান মুছে ফেলি। এরপর ঐ কাপড় একবার ধৌত করে নির্দিষ্ট স্থানটি তৃতীয়বার মুছে ফেলি। এরপর সর্বশেষ একবার কাপড়টি ধুয়ে রৌদ্রে বা বাতাসে শুকাতে দেই।

উল্লেখ্য, প্রথমে যে কাপড়টি তিনবার ধৌত করি তখন অথবা এর পরবর্তীকালে যে কয়েকবার ধৌত করি ঐ সময়ে যদি অল্প অল্প পানির ছিটা আমার শরীর বা পরিধেয় কাপড়ে লাগে তাহলে শরীর বা পরিধেয় কাপড় কি নাপাক হবে?

বি.দ্র. সতর্ক থাকার পরও দুই-এক ফোঁটা পানি লেগে যায় বা পানি না লাগলেও অনেক সময় অযথা সন্দেহ লাগে যে, কাপড়ে নাপাকি লেগে গেছে। এই কারণে ফ্লোরে পেশাব পড়লে তা পরিষ্কার করতে অনেক বিরক্ত লাগে। কি করলে আমি এই সন্দেহ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি? তাছাড়া বাচ্চারা বারবার পেশাব করলে আরো বেশী বিরক্ত লাগে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য শরীয়তে কী করণীয় আছে?

(খ) ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হলে কাপড়ের যে স্থানে নাপাকী লাগে ফরয গোসল করার সময় তা কিভাবে ধৌত করব?

আমি যেভাবে করি তা হল, ঐ নাপাক কাপড় পরিবর্তন করে সম্পূর্ণরূপে তিন বার ধৌত করি এবং শরীরে যে স্থানে নাপাকী লেগেছে তা তিনবার ধৌত করি। উল্লেখ্য, কাপড় তিনবার ধৌত করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার ধৌত করার সময় বালতিও কি পৃথকভাবে ধৌত করতে হবে? অতঃপর কাপড় ও শরীরের নাপাকী দূর করা হলে উযূ করে গোসল সেরে নেই। ফরয গোসলের বেলায় আমার এ পদ্ধতি কি ঠিক আছে? ঠিক না থাকলে কিভাবে করব? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

বি.দ্র. ফরয গোসলের পূর্বে যদি হাতে বীর্য লাগে তাহলে গোসল করতে যাওয়ার পূর্বে যে কাপড় নিয়ে যেতে হবে তা কিভাবে নিবো? পরিধেয় নাপাক কাপড়ের শুকনো অংশ দিয়ে হাত মুছে তারপর কাপড় নিয়ে গোসলখানায় প্রবেশ করলে হবে কিনা? এবং ফরয গোসলের সময় গায়ে গেঞ্জি থাকলে সেটা খোলার সময় তাতে নাপাকী না লাগলে সেটা পরিধান করে কি নামায পড়া যাবে?

(গ) দাঁতমাজার সময় ব্রাশ অথবা মিসওয়াক দিয়ে মাজার পরে রক্ত বের হয়। দাঁতমাজার পর যখন কুলি করি তখন কুলির রং লাল দেখা যায়। এভাবে অনেকক্ষণ কুলি করার পর কুলির রং লাল হয় না, অর্থাৎ সাদা হয়ে যায়। সমস্যা হল, অনেক সময় সাদা রং বের হওয়ার পরও সন্দেহ থাকে এবং কুলি করতে থাকি। তাই উযূ করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। এ ছাড়া আমি উযূ করার পরে অনেক সময় থুথু ফেলে দেখি থুথুর সাথে রক্ত বের হয়েছে কিনা বা থুথুর রং কেমন? এখন জানার বিষয় হল, থুথুর রং কিরকম হলে উযূ নষ্ট হবে না? আমার অনেক সময় থুথুর রং হলুদ বের হয়। আবার কোন শক্ত খাবার যেমন পেয়ারা, আখ ইত্যাদি খাওয়ার পর অবশিষ্ট খাবারের সঙ্গে লাল রং লেগে থাকে এ অবস্থায় উযূ বহাল থাকবে কিনা?

উত্তর (ক) ফ্লোর যদি টাইলস জাতীয় হয় বা নেট ফিনিশিং কৃত হয়, যা পেশাব শোষণ করে না তবে পবিত্রকরণের যে পদ্ধতি আপনি গ্রহণ করছেন, তার মাধ্যমে ফ্লোর পবিত্র হয়ে যাবে। তবে পানি দিয়ে ধোয়া সর্বোত্তম পন্থা।

পক্ষান্তরে ফ্লোর যদি পেশাব শোষণ করে নেয় তাহলে পেশাব শুকিয়ে যাওয়ার পর গন্ধ দূর হয়ে গেলে মোছা ছাড়াই পবিত্র হয়ে যাবে।

নাপাক কাপড় ধোয়ার সময় পানির যে ছিটা অন্য কোন পাক কাপড়ে লাগে, তার আয়তন যদি হাতের তালুর মাঝের নিচু অংশ পরিমাণ না হয় এবং নিংড়ালে পেশাবের ফোঁটা না ঝরে তবে এ কাপড় ধোয়া আবশ্যক নয়। অর্থাৎ না ধুয়ে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে। অন্যথায় তা ধোয়া আবশ্যক; ধোয়া ব্যতিত ঐ কাপড়ে নামায সহীহ হবে না।

সতর্কতার পরও যদি অযথা সন্দেহ হয় এবং এ ধরনের সন্দেহ নিয়মিতই হয়ে থাকে তাহলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। কারণ এই সন্দেহকে প্রশ্রয় দিলে তা বাড়তেই থাকবে। (সূরা তাওবা- ১০৮, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৪৭, বাদায়িউস সানায়ে' ১/৪৩২, ৪৪১, ফাতাওয়া শামী ১/৩১৬-৩১৮, ৩৩১, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১৫৫, ৪৭৮, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/৩৩১-৩৩২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৯৬, ৯৭, ১০০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮/৩২৭, ৩০৩)

(খ) ফরয গোসল করার সুন্নাত তরীকা হল, পবিত্রতার নিয়ত করে বিসমিল্লাহ পড়া। এরপর উভয় হাত ধৌত করে লজ্জাস্থান ও নাপাকির স্থান পরিষ্কার করা। অতঃপর হাত ভালোভাবে ধুয়ে পূর্ণ উযূ করে নেয়া। এক্ষেত্রে কুলি ও নাকে পানি দেয়া ফরয।

অতঃপর পুরো শরীরে তিনবার পানি ঢালা। এক্ষেত্রে প্রথমে মাথায়, তারপর ডান কাঁধে, তারপর বাম কাঁধে পানি ঢালা।

কাপড় তিনবার ধৌত করার সময় বালতি পৃথকভাবে ধোয়ার প্রয়োজন নেই। প্রথম ও দ্বিতীয়বার ধোয়ার পর সব পানি ফেলে নতুন পানি নিলেই চলবে।

হাতে লেগে থাকা বীর্য যদি শুকিয়ে যায় বা শুকনো কাপড় দ্বারা হাত মুছে নেওয়া হয় তাহলে এ হাত দ্বারা শুকনো কাপড় স্পর্শ করতে কোন অসুবিধা নেই।

পরিধেয় গেঞ্জিতে নাপাকী না লাগলে তা গায়ে দিয়ে নামায আদায় করতে কোন সমস্যা নেই। (সূরা মায়িদা- ৬, সহীহ বুখারী; হা.নং ২৭৪, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/২৬৯, ফাতাওয়া শামী

১/১৫১-১৫২, ১৫৬-১৫৯, ৩৩২-৩৩৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৬৪-৬৫, ৯৭, বাদায়িউস সানায়ে' ১/২৬৭-২৭১)

(গ) উযূ করার পর থুথুর সঙ্গে রক্তের পরিমাণ সমান বা বেশি হলে উযূ নষ্ট হয়ে যাবে। আর থুথুর তুলনায় রক্তের পরিমাণ কম হলে উযূ নষ্ট হবে না। কাজেই কুলি করার পর রক্তের পরিমাণ থুথুর চেয়ে কম হলে সেদিকে আর ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই।

কোন শক্ত খাবার কামড় দেয়ার পর তার অবশিষ্ট অংশে যদি রক্ত দেখা যায়, তখন আলাদা কোথাও থুথু ফেলে লক্ষ্য করবেন। যদি রক্তের পরিমাণ থুথু থেকে সমান বা বেশি হয় তাহলে উযূ থাকবে না। আর রক্তের পরিমাণ কম হলে উযূ নষ্ট হবে না। (ফাতাওয়া শামী ১/১৩৮-১৩৯, বাদায়িউস সানায়ে' ১/২৩৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৬১, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/২৪৪-২৪৫, আল-মুহীতুল বুরহানী ১/৬০, আল-জাহারাতুন নায়্যিরাহ ১/১৫)

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩৮৬ প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় গরু, ছাগল পালার জন্য একজন আরেক জনকে বর্গা দেয়। এর পদ্ধতি হল, কেউ একটি গরু উদাহরণত ২০ হাজার টাকায় ক্রয় করে আরেকজনকে এই শর্তে পালতে দিল যে, গরুটি পালতে যত টাকা খরচ হবে তা দু'জনে অর্ধেক অর্ধেক করে প্রদান করবে। পরে যখন গরুটি বিক্রি করবে তখন মূল ২০ হাজার টাকা মালিক নিবে আর লাভের অংশটা দু'জনে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে নিবে।

প্রশ্ন হল, এই পদ্ধতিতে গরু বা ছাগল পালা জায়েয আছে কিনা? যদি জায়েয না থাকে তাহলে এর কোন বৈধ সূরত আছে কি না? মাসআলাটি দলীলসহ জানালে খুব উপকৃত হব। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে গরু ছাগল বর্গা দেয়া হানাফী মাযহাব মতে জায়েয নয়। অবশ্য হাম্বলী মাযহাব মতে জায়েয। বর্গার উল্লেখিত পদ্ধতি গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকতর এবং বিষয়টি মু'আমালা (লেনদেন) সংক্রান্ত। তাই হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী ফাতাওয়া দিয়েছেন।

তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কেউ উক্ত মু'আমালা করতে চাইলে তার নিয়ম হল–

এক. পশুর মালিক পশুর অর্ধেক বর্গাগ্রহীতার নিকট বিক্রি করে দিবে। অতঃপর অর্ধেক পশুর ক্রয় বাবদ যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেই টাকা পরিশোধ করা থেকে বিক্রেতা তথা বর্গাদাতা বর্গাগ্রহীতাকে মাফ করে দিবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে পরবর্তীকালে ঐ পশুর দুধ উভয়ে সমানহারে পাবে। আর বাচ্চা হলে উভয়ে বাচ্চার মধ্যে অংশীদার হবে, চাই বাচ্চা একটি হোক বা দু'টি হোক।

তবে যদি এই শর্ত করা হয় যে, দু'টি বাচ্চা হলে প্রত্যেকে একটি করে নিয়ে নিবে তাহলে তা জায়েয হবে না। কারণ সে ক্ষেত্রে দুই বাচ্চার মধ্যে ব্যবধান থাকা নিশ্চিত এবং কে কোন্টা নিবে সেটাও নির্ধারণ করা মুশকিল। অতএব এই শর্ত জায়েয নয়।

দুই. পশুর মালিক বর্গাগ্রহীতাকে বলবে, 'আমার গরু/ছাগলটা তুমি এক বছর লালন-পালন কর। তোমাকে এত টাকা দিব।' অতঃপর যদি বর্গাদাতা বর্গাগ্রহীতাকে ঐ টাকা না দিয়ে ঐ টাকার পরিবর্তে উভয়ের সন্তুষ্টির মাধ্যমে গরুর বাছুর বা ছাগলের বাচ্চা প্রদান করে তাহলে তা জায়েয হবে। কিন্তু প্রথমেই যদি এই শর্ত করে নেয় যে, এক বছরের বাচ্চা আমার, পরের বছরের বাচ্চা তোমার তাহলে তা জায়েয হবে না। (আল-মাবসূত ১২/২০, আল-হিদায়া ৪/২২৫, আল-বিনায়া ১০/৫৭৩-৫৭৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৪৮১, ফাতাওয়া শামী ৬/৪৬, আল-মুগনী ৮/১৫-১৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৭/৩০১)

মসজিদ পরিচালনা কমিটি
মির্জা মান্না দেউরী জামে মসজিদ, চকবাজার, ঢাকা

৩৮৭ প্রশ্ন : আমরা মির্জা মান্না দেউরী জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য। অন্যান্য মসজিদের ন্যায় আমাদের মসজিদেও দাওয়াত ও তাবলীগের নামে সাদপন্থীরা তাদের গোমরাহী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ মুসল্লীদের অনেককেই তারা তাদের মতবাদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায় মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে তাদের উক্ত কার্যক্রমের ব্যাপারে আমাদের করণীয় প্রসঙ্গে আপনাদের ফাতাওয়া বিভাগ থেকে গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু সমাধান চাচ্ছি। এ ব্যাপারে আমাদেরকে শরয়ী দিকনির্দেশনা প্রদান করে বাধিত করবেন।

উত্তর : মাওলানা সাদ সাহেব কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াত ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীসের অপব্যাখ্যা করেছেন। তিনি কয়েকজন নবী-রাসূলের শানে বেয়াদবীমূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন। হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও দীনী ইলমের ব্যাপারে জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী বিভিন্ন বক্তব্য জনসম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। এতে উম্মতের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে এবং এই কাজ তিনি এখনো করে যাচ্ছেন। এজন্য দারুল উলূম দেওবন্দসহ অন্যান্য বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম তার ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে তাকে সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে তা করেননি এবং বাহ্যত করার আশাও নেই।

এমতাবস্থায় হক্কানী উলামায়ে কেরাম মুসলমান জনসাধারণের ঈমান রক্ষার্থে অনেকগুলো ওয়াযাহাতী জোড় করে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যাতে কিয়ামতের ময়দানে তারা উলামায়ে কেরামকে দোষারোপ করতে না পারে যে, সাদ সাহেব পথভ্রষ্ট ছিলেন এ কথা উলামাগণ আমাদেরকে বলেননি।

অতএব, শরয়ী বিধান মতে তিনি একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। আর বিভ্রান্ত ব্যক্তির অনুসারী এতায়াতীরাও বিভ্রান্ত ও গোমরাহ। তাদের গোমরাহীর কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ-

১. তারা হক্কানী উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ রাখে এবং তাদেরকে গালি-গালাজ, মারধর ও আহত করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ হাদীসে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকী কাজ। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৮)।

এই হাদীস অনুযায়ী যেখানে একজন সাধারণ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী কাজ, সেখানে দেশের অসংখ্য উলামায়ে কেরামকে গালাগাল করা কত মারাত্মক গুনাহ, তা সহজেই অনুমেয়। অথচ হযরতজী ইলয়াস রহ. বলেন, আমাদের তাবলীগী কাজে যে কোনো মুসলমানের মূল্যায়ন এবং উলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মানবোধ বুনিয়াদী বিষয়। প্রত্যেক মুসলমানকে তার ঈমানের জন্য এবং উলামায়ে কেরামকে তাঁদের ইলমে দীনের মহাদৌলতের কারণে সম্মান করা উচিৎ। (মালফূযাতে মাওলানা ইলিয়াস; পৃষ্ঠা ৫০)

২. তারা হক্কানী উলামায়ে কেরামের দীনী মাদরাসাসমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে, যেমনটি ইসলাম বিদ্বেষীরা করে থাকে। জনসাধারণকে উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, যে অপচেষ্টা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণে তারা তাবলীগের বর্তমান পদ্ধতিকে দীনের একমাত্র কাজ মনে করে দীনের অন্যান্য কাজ তথা তা'লীম, তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি ইত্যাদিকে খাটো ও হেয় প্রতিপন্ন করছে। সর্বোপরি নিজেদের হঠকারিতা-বশত হক্কানী আলেমদের কথাগুলোকে মানতে পারছে না।

তাদের এ জাতীয় আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যার সামষ্টিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে বলা যায়, বর্তমানের এতায়াতী নামক দলটি নিঃসন্দেহে একটি বাতিল দল। যদি সাধারণ মানুষ এতায়াতীদের সাথে উঠা-বসা করে কিংবা তাদের তা'লীমে বা বয়ানে বসে তাহলে উপরোক্ত একাধিক সমস্যায় জড়িত এতায়াতী ব্যক্তির সংশ্রবের প্রভাবে তাদের ঈমান-আকীদা বিনষ্ট হওয়ার সমূহ-আশঙ্কা রয়েছে।

মসজিদ সঠিক দীন প্রচার-প্রসারের মারকায। এখানে কোন বাতিল দলকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেয়ার অর্থই হল উম্মতের মাঝে গোমরাহী ছড়ানোর কাজে সহযোগিতা করা। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো। আর গুনাহ ও গোমরাহীর কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা করো না।' (সূরা মায়িদা- ২)

কোনো মসজিদ-কমিটি যদি মসজিদে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেয় আর পরিণতিতে কেউ তাদের গোমরাহী চিন্তাধারার শিকার হয় , তাহলে এর জন্য সংশ্লিষ্ট মসজিদ কর্তৃপক্ষ অবশ্যই দায়ী হবেন। মসজিদে সকল ধরনের মুসল্লীর নামায পড়ার অধিকার থাকলেও দাওয়াতী কাজ একমাত্র হকপন্থী উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে হবে। কোন বাতিল দলের দাওয়াতী কাজ মসজিদে করতে দেয়ার সামান্যতম সুযোগও নেই। কাজেই মুসল্লীদের ঈমান আকীদা হেফাযতের স্বার্থে মসজিদ কমিটির জন্য এতায়াতীদেরকে কার্যক্রম চালানোর সুযোগ দেয়া জায়েয হবে না।

সুতরাং তাদেরকে মসজিদে কার্যক্রম চালাতে নিষেধ করতে হবে। অবশ্য তারা খুবই ঝগড়াটে ও ফিতনাবাজ স্বভাবের। সুতরাং ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়ার যেন সুযোগ না পায় সেদিকেও যথাসম্ভব খেয়াল রাখতে হবে। (সূরা মায়িদা- ২, সূরা আন'আম- ৬৮, সূরা বাকারা- ৪২, সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৮, ১০০, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৬/৪৩৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২/২৪৩, মালফূযাতে হযরত মাওলানা ইলয়াস; পৃষ্ঠা ৫০)

মুহাম্মাদ যাকারিয়া
কোনাপাড়া, ঢাকা

৩৮৮ প্রশ্ন : (ক) মাদরাসার নিজস্ব মসজিদ নেই। আশপাশের মসজিদে যেতে হলে প্রধান সড়ক পার হতে হয়। ছাত্রদের নিরাপত্তার স্বার্থে উস্তাদগণ মসজিদে যাওয়া উপযুক্ত মনে করেন না। এমতাবস্থায় মাদরাসায় জুমু'আর নামায আদায় করা কি বৈধ হবে?

(খ) সমাজে প্রচলন আছে, পুকুরের উপর ঘর বানিয়ে হাঁস পালন করা হয় এবং একই পুকুরে মাছ চাষ করা হয়। উদ্দেশ্য থাকে, মাছ হাঁসের বিষ্ঠা খেয়ে বড় হবে। এভাবে হাঁসপালন ও মাছচাষ করা কি বৈধ আছে এবং এ জাতীয় মাছ খাওয়ার বিধান কী? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : (ক) যে মহল্লায় জুমু'আর নামায পড়া বৈধ সেখানে মসজিদে না গিয়ে মাদরাসায় জুমু'আ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল ইযনে আম থাকা। অর্থাৎ যে স্থানে জুমু'আ আদায় করা হবে, নামাযের সময় তার গেট খোলা রেখে মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল নামাযীকে নামাযে শরীক হওয়ার অনুমতি দিতে হবে। এই শর্ত পূরণ করা হলে উল্লিখিত প্রয়োজনে ছাত্ররা মসজিদে না গিয়ে মাদরাসায় জুমু'আর নামায আদায় করলে নামায সহীহ হবে। তবে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার সাওয়াব পাওয়া যাবে না। সুতরাং যাদের পক্ষে মসজিদের জামাআতে শরীক হতে সমস্যা নেই তারা মসজিদের জামাআতে শরীক হওয়ার চেষ্টা করবে। (ফাতাওয়া শামী ২/১৪৪, ১৫১, আল-বাহরুর রায়িক ২/১৫৩, ১৬২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৪৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৫/৭৩, ৮২, ৯৫, ফাতাওয়া উসমানী ১/৫১৯)

(খ) কোন প্রাণীকে নাপাক বস্তু খাওয়ানো শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। কাজেই পুকুরের উপর ঘর বানিয়ে হাঁসপালনের মাধ্যমে মাছকে হাঁসের বিষ্ঠা বা এ জাতীয় নাপাক জিনিস খাওয়ানো মূলত বৈধ নয়। তবে এ জাতীয় মাছ বাজার থেকে ক্রয় করা এবং খাওয়া জায়েয। (আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৪০/১০৮, ফাতহুল কাদীর ১০/৯৬, ফাতাওয়া শামী ১/৩০২, ৬/৩০৬, আদ্দুররুল মুখতার শরহু তানবীরুল আবসার ওয়া জামিউল বিহার; পৃষ্ঠা ৪১৬, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ২৪/১১৫, ১১৬)

বিনতে আব্দুল মুবীন
গুলবাগ, ঢাকা

৩৮৯ প্রশ্ন : (ক) কান থেকে তরল ঘন পানি বের হলে করণীয় কী? এর ফলে কি উযূ ভেঙ্গে যাবে এবং সেই পানি কি নাপাক?

(খ) একব্যক্তি বসে নামায আদায় করছিল। সে তৃতীয় রাকা'আতের কিয়ামের সময় হাত না বেঁধেই কিরাআত পড়া শুরু করল। এখন তার করণীয় কী?

(গ) চোখ উঠলে চোখ থেকে যে পানি বের হয়, তার কারণে কি উযূ ভেঙ্গে যাবে এবং এই পানি কি নাপাক?

উত্তর : (ক) কান থেকে যদি অসুস্থতার দরুন ঘন পানি নির্গত হয়ে থাকে আর এ পানি গড়িয়ে কানের বাইরে চলে আসে, তাহলে উযূ ভেঙ্গে যাবে এবং সেই পানি নাপাক বিবেচিত হবে। তবে যদি সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ পানি বের হয় বা অসুস্থতার দরুন বের হওয়া ঘন পানি কানের ভেতরেই থেকে যায় তাহলে উযূ ভাঙবে না। (হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৮৭, ৮৮, ফাতাওয়া শামী ১/১৪৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১০, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৮৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮/১৩৫)

(খ) অসুস্থতার দরুন বসে নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে কিরাআত কিয়ামের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে তৃতীয় রাকা'আতে হাত না বেঁধে কিরাআত শুরু করার দ্বারা তার তৃতীয় রাকা'আত শুরু হয়ে গিয়েছে। আর হাত বাঁধা যেহেতু সুন্নাত তাই হাত ভুলে না বাঁধার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। সুতরাং রুকুর পূর্বে স্মরণ হলে হাত বেঁধে নিবে অন্যথায় সে অবশিষ্ট নামায স্বাভাবিক নিয়মে শেষ করবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৮৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১২৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪২)

(গ) চোখ উঠার কারণে যে পানি বের হয়, তা যদি স্বাভাবিক পানি হয়, তাহলে উযূ ভাঙবে না। তবে যদি রং পরিবর্তিত হয় তাহলে উযূ ভেঙ্গে যাবে। (ফাতহুল কাদীর ১/১৮৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১/১৩৪, ১৪৩)

কিশোর প্রতিভা

লকডাউনের দিনগুলো

চৈত্রের শেষাশেষি। বৈশাখ তখনো পড়েনি। বিশ্বজুড়ে লকডাউন। ইউরোপ-আমেরিকা-জুড়ে মৃত্যু-মিছিল। প্রচণ্ড আতঙ্কিত সবাই। সন্ধ্যা নামতেই রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে যায়। নীরব হয়ে যায় পুরো এলাকা। কোথাও সাড়া-শব্দ নেই। দূরে কোথাও ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে একটা কুকুর। পরিবেশটা হয়ে ওঠে আরো ভয়ঙ্কর, আরো রহস্যময়।

ভোর-সকালে তেমন কোন কাজ নেই। ফজরের পর একটু তিলাওয়াত করে বারান্দায় গিয়ে বসি। আকাশকে আবির রঙে রাঙিয়ে সূর্য ওঠে। নিবিষ্ট মনে চেয়ারে বসে সূর্যোদয় দেখার মধ্যে যে একটা গাঢ় আনন্দের ব্যাপার আছে– খুব অনুভব করতে পারি।

দশটা নাগাদ রোদের তেজ বাড়ে। ভেতরের বারান্দায় বসে বিভিন্ন পাখির আনাগোনা দেখি। একটা কালোরঙা পাখি প্রতিদিন উঠোনে এসে দাঁড়ায়। দূরে কোথায় দুঃখী গলায় একটা ঘুঘু ডেকে ওঠে। ভাবি– ঘুঘুটার এমন কী কষ্ট! ওর গলায় এমন কী দুঃখ!

চৈত্রের দীঘল দুপুর। ঝাঁঝালো রোদ। রুমে বসে খানিকটা তিলাওয়াত আর সীরাতপাঠে সময় গড়াই। বই পড়তে পড়তে চোখে ঘুম নেমে আসে। বিকেলে জাগি। আম্মুর সঙ্গে রান্নার কাজে নিজেকে জড়াই। কিন্তু পরক্ষণেই অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, রান্নাঘরের এসব জ্বালা-যন্ত্রণা সওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আম্মুর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় মন ভিজে ওঠে!

কোন কোন দিন অপূর্ব জোছনা নামে। আলোয় ভাসতে থাকে পৃথিবী। খালিপায়ে সবুজ দুর্বাঘাসের উপর বসে উথাল-পাথাল জোছনা দেখি। জোছনাপ্লাবিত পৃথিবীটা দেখতে বড় ভালো লাগে। কাঁঠাল গাছের সবুজ পাতায় চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়। সবকিছু কেমন স্বপ্ন-স্বপ্ন লাগে। অজান্তেই বলে উঠি, কী সুন্দর তোমার সৃষ্টি হে আল্লাহ!

এক-এক দিন আকাশ ভেঙে ঝুম বৃষ্টি নামে। আয়োজন করে বৃষ্টিতে ভিজি। হা-করে বৃষ্টির পানি খাওয়ার চেষ্টা করি। ক্ষণিকের জন্য এই ঘরবন্দি জীবনটাও আনন্দময় হয়ে ওঠে। এভাবেই কেটে যায় লকডাউনের দীর্ঘ সময়গুলো। এ সময় প্রকৃতিকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। গভীরভাবে অনুভব করেছি। প্রকৃতির মাঝে খুঁজে পেয়েছি স্রষ্টার পরিচয়। খুঁজে পেয়েছি শিক্ষার অনেক উপকরণ।

উমায়ের বিন রফিক
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

সুন্দরবনে একদিন

সফর জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। জানার পরিধি বিস্তৃত করে। শখ ছিল মন ভরে ঘুরে দেখব বিচিত্র পৃথিবী। যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অপরূপ সব কুদরতী শোভা। পরীক্ষার ছুটিতে খুলনায় বেড়াতে গেলাম। ছোট চাচা নিয়ে গেলেন সুন্দরবন দেখানোর জন্য।

সুন্দরবন। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি। বাংলাদেশ-ভারত দুই দেশেই এর অবস্থান। বাংলাদেশ অংশের আয়তন ৬০১৭ বর্গমাইল। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী জেলা জুড়ে বিস্তৃত। সুন্দরী গাছের প্রাচুর্যের কারণে এর নাম সুন্দরবন। শুধু সুন্দরী নয়– গরান, গেওয়া, ঝামটি, কেওড়া-সহ ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে সুন্দরবনে। আছে ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২৭০ প্রজাতির পাখি, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ ১২০ প্রজাতির মাছ এবং ৮ প্রজাতির উভচর প্রাণী।

প্রথমে এলাম মংলা বন্দরে। এখান থেকে বোটে চড়লাম। বোট মোহনায় দুলছে। আমার মনজুড়ে তখন আনন্দের হিল্লোল। চোখে অপার বিস্ময় ও কৌতূহল। অন্তহীন জলরাশি দেখতে দেখতে একসময় পৌঁছে গেলাম সুন্দরবন।

বনের ধারে যে গাছগুলো নজরে পড়ল– সেগুলোর কোনটা গরান, কোনটা বাইন আর কোনটা গেওয়া। এসব গাছ খুব একটা বড় হয় না। বড়জোড় সাত-আট ফুট দীর্ঘ হয়। গেওয়ার কাঠ দিয়ে কুঁড়েঘর বানানো হয়।

সামনে একটা বড় চাতাল। চারদিকে লোহার বেষ্টনী। ভেতরে একপাল চিত্রা হরিণ। আপন মনে পাতা খাচ্ছে। পাশেই একটা পুকুর। অনেকগুলো কুমির রোদে মরার মতো পড়ে আছে। পুকুরের সামনে একটি ওয়াচ-টাওয়ার। টাওয়ার পার হতেই একটা কাঠের পুল। বড়জোর দুই গজ চওড়া। পুলের সামনে বিজ্ঞপ্তি সাঁটানো– 'সারিবদ্ধভাবে চলাচল করুন।' পুলের নিচে কাদাপানি। ছোটছোট লাল কাঁকড়া ছুটোছুটি করছে। মানুষের উপস্থিতি টের পেতেই সন্তর্পণে গর্তে লুকিয়ে যাচ্ছে। কাদার মধ্যে ছোট ছোট মাছও লাফালাফি করছে। জোয়ারের সময় এসেছিল; ভাটায় আটকে পড়েছে।

সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ভীষণ ভয়ঙ্কর আর মানুষখেকো। আরও আছে কুমির, শুকর, সাপসহ নানা ধরনের হিংস্র প্রাণী। জঙ্গলে প্রতিবছর গড়ে ১৫০জন মানুষ বাঘের হাতে মারা পড়ে। আমরা বনের যেখানটাতে গিয়েছি সেখানে অবশ্য অতোটা ভয় নেই। বাঘ থাকে সাধারণত গভীর জঙ্গলে।

আমরা ওয়াচ টাওয়ারে আরোহন করলাম। উপরে উঠে দেখি, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। সবুজের এমন বিপুল সমারোহ জীবনে এই প্রথম দেখলাম। ওয়াচ টাওয়ারের পাশে একটি জাদুঘর। এখানে আছে পুরো সুন্দরবনের মানচিত্র। আছে কুমিরের ডিম, কঙ্কাল, বাঘের নখ ও পায়ের ছাপ।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। বোটে ফিরে এলাম। বড় বড় ঢেউ ঠেলে বোট এগিয়ে চলছে। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে সুন্দরবন। একসময় মিলিয়ে গেলো দিগন্তের কোলে। নদীর মাঝেই নেমে এলো রাত। মাথার উপর তারার মেলা। চারপাশে অথৈ জলরাশি। ভাবছি, আনন্দঘন প্রহর কতই না দ্রুত শেষ হয়ে যায়!

আদনান সাকিব
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আল্লামা আহমাদ শফী : আমার নক্ষত্র

আগের যুগে অভিযাত্রীরা নক্ষত্র দেখে পথ চলতো। এখনো চলে দিকহারা নাবিক আর পরিযায়ী পাখি। নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে তারা পাড়ি দেয় হাজার মাইল পথ। বন-জঙ্গল, পাহাড়-সাগর আর মরু-বিয়াবান তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ভেবে দেখেছেন, কখনো যদি নক্ষত্র নেই হয়ে যায়, কিংবা ঢাকা পড়ে যায় মেঘের আড়ালে তখন অভিযাত্রীদের কী দুর্দশাই না পোহাতে হয়!

আমার ছোট্ট জীবনে আল্লামা আহমাদ শফী রহ. ছিলেন তেমনই এক নক্ষত্র। শৈশবের উচ্ছ্বাস আর তারুণ্যের আবেগের সঙ্গে লেপ্টে আছে হুযূরের অনেক স্মৃতি।

ক. তখন হিফজখানায় পড়ি। মালিবাগ জামি'আয়। খতমে বুখারীর অনুষ্ঠানে হুযূর প্রধান মেহমান হয়ে তাশরীফ আনলেন। দূর থেকে দেখলাম। হুযূরের বয়ান শুনলাম। কচি মনে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ জন্মালো।

খ. জামি'আ রাহমানিয়ায় মীযান জামাআতে পড়ি। নাস্তিকদের আস্ফালন তখন চরমে পৌঁছেছে। আল্লামা আহমাদ শফী রহ. লংমার্চের ডাক দিলেন। আমরা দলবেঁধে শরীক হলাম। বিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে মতিঝিল পৌঁছানোর পরও তেমন ক্লান্তি বোধ করিনি। সেখানে গিয়ে চিনলাম অন্য এক আহমাদ শফীকে, যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন, ইসলামের হেফাজতে জানবায সিপাহসালার।

গ. মাওলানা সাদ সাহেবের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য ও মতাদর্শের কারণে তাবলীগ জামাআতে বিভেদ সৃষ্টি হল। উম্মতকে ফিতনা থেকে সুরক্ষা দিতে হুযূর মুহাম্মদপুরস্থ কবরস্থান ময়দানে তাশরীফ আনলেন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া নব্বই-উর্ধ্ব মানুষটি থেমে থেমে কিন্তু বলিষ্ঠ উচ্চারণে ওয়াযাহাত করলেন। উম্মতকে সঠিক পথ বাতলে দিলেন। হুযূরের সঙ্গে এটাই ছিল আমার শেষ দেখা।

এরপর একসন্ধ্যায় হুযূরের ইন্তেকালের সংবাদ শুনলাম। ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দু'চোখ বেয়ে টপাটপ অশ্রু ঝরতে লাগল। হৃদয়পটে একসঙ্গে ভেসে উঠল পুরনো সব সুখস্মৃতি।

আকাঙ্ক্ষা ছিল, হুযূরের জানাযায় শরীক হবো। দরস চালু থাকায় যেতে পারিনি। অগত্যা দূর থেকেই দু'আ করে সন্তুষ্ট থাকতে হল।

আল্লামা আহমাদ শফী রহ. ছিলেন আমার জীবনের অন্যতম এক নক্ষত্র। তাকে আমি আল্লাহর জন্য ভালোবেসেছি। তার আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করছি। আল্লাহ তা'আলা হুযূরকে কবর ও হাশরে নিরাপদ রাখুন এবং জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আ-মীন।

আবু আলকামা আশরাফ
কুড়িল বিশ্বরোড

অমূল্য উপহার ইস্তিগফার!

অপরাধ আমরা করিই! অপরাধ না করে থাকতে পারে এমন মানুষ আছেন, তবে সংখ্যায় কম। গুনাহ করা ইবলিসের বৈশিষ্ট্য। গুনাহ না করা ফেরেশতাদের সিফাত। আমরা মানুষ একইসঙ্গে উভয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করি। এক-এক সময় আমাদের মধ্যে এক-এক বৈশিষ্ট্য প্রবল থাকে; কখনও ফেরেশতার, কখনও ইবলিসের। অপরাধ বা গুনাহ করার পর আমাদের দুই রকমের অবস্থা হয়। **এক.** হযরত আদম আলাইহিস সালামের অবস্থা। **দুই.** ইবলিসের অবস্থা। ইবলিস অপরাধ করার পর কী করেছিল? অহঙ্কার করেছিল। দোষ স্বীকার না করে উল্টো আল্লাহর প্রতি অভিযোগ তুলেছিল– 'হে প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমাকে গোমরাহ করেছেন...।' পক্ষান্তরে হযরত আদম আলাইহিস সালাম কী করেছিলেন? তিনি আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত নতজানু হয়েছিলেন। বিনীত ভঙ্গিতে কাঁচুমাচু হয়ে বলেছিলেন– 'ইয়া রব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, আমরা তো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো!'

আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই ইস্তিগফার তথা বিনীত ক্ষমাপ্রার্থনা বড় পছন্দ করেছেন। তাকে ক্ষমা করে উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। বস্তুত গুনাহ হয়ে গেলে ইস্তিগফার করতে পারা আল্লাহ তা'আলার বড় নেয়ামত, অমূল্য উপহার! গুনাহ-খতায় অভ্যস্ত বান্দার জন্য এটা সর্বাধিক প্রয়োজন! আল্লাহ ত'আলা আমাদেরকে ইস্তিগফারে অভ্যস্ত হওয়ার তাওফীক দিন। আ-মীন।

মাসুম বিল্লাহ
জামি'আ ইসলামিয়া, চর ওয়াশপুর, ঢাকা

কুমন্ত্রণা দূর করার অব্যর্থ উপায়

অনেক দিন যাবৎ ওয়াসওয়াসা তথা অন্তরে সৃষ্ট কুমন্ত্রণা নিয়ে কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। হৃদয় প্রশান্তকারী উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ সেদিন মুফতী মনসূরুল হক ছাহেব হুযূর দা.বা. রবিবারের সাপ্তাহিক মজলিসে ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। হুযূর বললেন– 'ওয়াসওয়াসা আসে শয়তানের পক্ষ হতে শুধু মুমিনের অন্তরে। কাফেরের অন্তরে কখনও ওয়াসওয়াসা আসে না। কারণ, কাফেরকে ওয়াসওয়াসা দেয়ার শয়তানের দরকার নেই; কাফের তো এমনিতেই শয়তানের দলে ভিড়ে আছে। শয়তান ওয়াসওয়াসা দিয়ে মুমিনের ঈমান ছিনতাই করতে চায়, তাদেরকে নিজের দলে শামিল করতে চায়। এজন্য কখনও মনের মধ্যে ওয়াসওয়াসা আসলে আনন্দিত হবে এবং শোকর আদায় করবে যে, আলহামদুলিল্লাহ! এখনও আমার অন্তরে ঈমানের দৌলত বিদ্যমান আছে; না থাকলে শয়তান এভাবে হামলা করতো না! অতঃপর এই পাঁচটি কাজ করবে–

ক. ওয়াসওয়াসা টের পাওয়া মাত্রই সর্বপ্রথম আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম পড়বে।

খ. আ-মানতু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহী পড়বে।

গ. বাম দিকে তিনবার থুঃ-থুঃ করবে।

ঘ. অন্য কোন চিন্তায় লেগে যাবে। কেননা মানুষ একইসঙ্গে দু'টি বিষয়ে চিন্তা করতে পারে না।

ঙ. নামাযে বা উযূতে ওয়াসওয়াসা আসলে কোন পরওয়া করবে না। উদাহরণত ভালো করে হাত ধোয়ার পর পা ধুতে গিয়ে মনে হল, হয়তো কনুইটা শুকনো রয়ে গেছে। কিংবা দ্বিতীয় রাকাআতে গিয়ে মনে হল, প্রথম রাকাআতে সিজদা হয়তো একটা দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় মনে মনে শয়তানকে বলবে– ঠিক আছে, আমি এই অসম্পূর্ণ উযূই করবো এবং অসম্পূর্ণ নামাযই পড়বো তবু তোর কথা শুনবো না। এভাবে কয়েক দিন করা হলে দেখবে, আর ওয়াসওয়াসা আসছে না।'

অল্পকথায় ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে এমন চমৎকার আলোচনা শুনে আমার কী-যে উপকার হয়েছে, বলে বোঝাতে পারবো না। আল্লাহ তা'আলা হুযূরকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং হায়াতে তাইয়িবা নসীব করুন।

সা'দ বিন আবূ সাঈদ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

কিশোর বন্ধুরা! রাবেতার কিশোর প্রতিভা পাতায় লেখা আহ্বান করা হয়েছিল। তোমাদের আন্তরিক সাড়া আমাদেরকে যারপরনাই আনন্দিত করেছে। বেশিরভাগ লেখা সুন্দর হয়েছে। নির্বাচিত লেখাগুলোর কিছু এ সংখ্যায় ছাপা হলো। বাকিগুলো পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে। ছাপা হোক, না-হোক নিয়মিত লিখতে থাকো; ইনশাআল্লাহ একদিন তোমার লেখা উম্মাহর কল্যাণ বয়ে আনবে।

কিছু পরামর্শ: (ক) লেখার জন্য সহজ বিষয় নির্বাচন করবে। (খ) কোন ব্যাপারে বন্ধুদের সঙ্গে যেভাবে গল্প করো সেভাবে সহজ করে লিখবে। (গ) ছোট ছোট বাক্যে লিখবে। (ঘ) লেখার পর কানে বাজিয়ে বারবার পড়বে। শ্রুতিমধুর হওয়া পর্যন্ত সংশোধন করতে থাকবে। (ঙ) বানানগুলো অভিধান খুলে যাচাই করে নিবে। (চ) নিজে নিজে চিন্তা-ভাবনা করে যা পারবে তা-ই লিখবে। কখনও অন্যের লেখা ধার করতে যাবে না।

সেরা তিন কিশোরকে ৫ (পাঁচ) কপি করে দ্বিমাসিক রাবেতা পুরস্কার দেয়া হবে। এ সংখ্যার সেরা তিন– উমায়ের বিন রফিক, আদনান সাকিব ও আবূ আলকামা আশরাফ। আল্লাহ সবাইকে সুস্থ রাখুন, নিরাপদ রাখুন।